পারমিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



।। এক ।।

পারমিতা প্রথম দু'বার আস্তে, তারপর একবার বেশ জোরে ডাকল, পারুল! পারুল!

কোন সাড়া নেই।

পারমিতার হাতে এক সাজি ফুল, সে ছাদের ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে।

ছাদে প্রায় একশোটি ফুলগাছের টব। দেখলেই বোঝা যায় এই গাছগুলো প্রত্যেক দিন খুব যত্ন পায়। প্রায় সব গাছেই ফুটে আছে ঝলমলে ফুল। কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা আর কাগজি লেবুর গাছও আছে।

ফুলের সাজিটা চৌকাঠের সামনে নামিয়ে রেখে পারমিতা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো দোতলায়।

এ ঘর ও ঘর খুঁজল। পারুল কোথাও নেই। তিনবারের বেশি পারমিতা কক্ষনো ডাকে না।

বাথরুমের দরজাটা বন্ধ। সেখানে গিয়ে পারমিতা দরজায় একটা ধাক্কা দিল। খুলে গেল দরজাটা। প্লাস্টিকের গামলায় সাবান জল গুলে পারুল জামা-কাপড় ভেজাচ্ছে।

তোকে ডাকছিলুম, শুনতে পাস নি?

ডাকছিলেন দিদিমনি? কাপড় কাচছিলুম, সেই জন্য শুনতে পাই নি।

পারুল, তুই আমার পূজোর ঘরে ঢুকেছিলি?

পারুল যেন একবারে আকাশ থেকে পড়ল। দু'চোখে শিশুর বিস্ময় ফুটিয়ে পারুল বলল, পূজোর ঘরে? আমি? কই না তো।

পারমিতা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল পারুলের দিকে। তারপর শান্তভাবে বলল, উঠে আয়।

পারুল উঠে দাঁড়িয়ে নিজের নিতম্বে সাবানমাখা হাত মুছল। তারপর আবার সেই রকম সরল বিস্ময়ের স্বরে বলল, সত্যি বলছি দিদিমনি, আমি পূজোর ঘরে ঢুকতে যাব কেন?

দোতলায় পাঁচখানা ঘর, ইংরেজী এল শেপের বারান্দা। শ্বেত-পাথরের মতন টালি বসানো। একেবারে মসৃণ, ঝকঝকে। একপাশে দুটি চেয়ার ও একটি বেতের টেবিল।

পারমিতা এসে একটি চেয়ারে বসল। কিছুক্ষণ আগে স্নান করে গেছে, তার চুল এখন ভিজে। মুখে কোন প্রসাধনের চিহ্ন নেই। পরনে একটা হাল্কা নীল শাড়ি। তার বয়েস চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। কলেজে পড়বার সময় পারমিতা একবার ছাত্র-ছাত্রীদের নাটকে শকুন্তলা সেজেছিল। সেই নাটক দেখে এক সিনেমা পরিচালক তাকে নিতে চেয়েছিল সিনেমার জগতে। পারমিতা রাজি হয় নি। অনেকে বলে, পারমিতা এখনও সেই রকমই সুন্দর আছে। শুধু মাঝে মাঝে তার কপালে দুটো ভাঁজ পড়ে।

পারমিতা চেয়ারে বসল, পারুল তখনও বাথরুমের কাছে দাঁড়িয়ে। সেখান থেকেই সে জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবেন দিদিমনি!

পারমিতা উত্তর না দিয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। অর্থাৎ পারুলকে তার সামনে এসে কথা শুনতে হবে।

পারুল কাছে এসে বলল, সত্যি বলছি, দিদিমনি–

পারমিতা বলল, তোকে কতবার বলব, পারুল কেউ মিথ্যে কথা বললে আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি। তুই তো জানিস, আমার পূজোর ঘরে অন্য কারুর ঢোকা আমি পছন্দ করি না

একটা বেড়াল ঢুকে পড়েছিল, আমি ফুল তুলতে দেখলাম–

কেন ফুল তুলছিলি? তোর কি ফুল তোলার কথা?

না না, ফুল তুলি নি! কোথায় ফুল তুলেছি? জল দিচ্ছিলুম টবে–

তখন তুই দেখলি, ঐ ঘরে একটা বেড়াল ঢুকছে। কোন্ বেড়ালটা?
ঐ তো খয়েরি রঙের হুলাটা! বিচ্ছিরি দেখতে।
তুই বোড়ালটা তাড়াবার জন্য ঐ ঘরে ঢুকলি?
হ্যাঁ।
তাহলে অন্য সময় ঐ বেড়ালটাকে দেখে তুই ভয় পাস কেন?
ইয়ে.....তা বলে তোমার ঠাকুরঘরে ঢুকলে তাড়াব না?
এর মধ্যে তুই সব মিলিয়ে কটা মিথ্যে বললি, পারুল? এক কাজ কর। ফ্রিজটা খুলে দ্যাখ, একটা সন্দেশের বাক্স আছে। কাল সন্ধ্যেবেলা এনেছিলুম। ওটা নিয়ে আয়।
পারুল চলে গেল সন্দেশ আনতে। রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় ফ্রিজ, এখান থেকে দেখা যায়। কিন্তু পারমিতা সেদিকে চেয়ে নেই।
পারমিতা একদৃষ্টিতে নিজের পায়ের আঙুল দেখতে লাগল।
পারুল বাক্সটা নিয়ে এলে পারমিতা মুখ তুলে বলল, খুলে দ্যাখ ক'টা আছে।
এই তো দেখছি, আটটা....ন'টা....দশটা। প্লেটে করে আপনার জন্য দেব দিদিমনি?
না, বাক্সটি তুই নিয়ে যা। তোর ছেলেমেয়েরা খাবে।
এতগুলো? না না, দিদিমনি, আমার এতগুলো দরকার নেই। এ রকম দামী সন্দেশ, তুমি নিজের জন্য এনেছ।
তুই নিয়ে যা। আর এক কাজ কর, আমার শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের টানা খুলে দ্যাখ, আমার পার্সটা আছে। সেটা নিয়ে আয়।
এবার পারুলের মুখে একটা ভ্যাবাচ্যাকা ভাব ফুটে উঠল। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছে। দিদিমনির ড্রেসিং টেবিলের টানা খোলার অধিকার তো তার ছিল না।
নিয়ে আয়। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?
পারুল চলে যেতেই পারমিতা দেখতে লাগল তার পায়ের আঙুল।
এ বাড়ির একতলায় ফুড কর্পোরেশানের গুদাম এবং তাদেরই একটি ছোট অফিস। এই রকম বেলা দশটা এগারোটার সময় রেশন দোকানের মালিকরা মালপত্র নিতে আসে। বেশ গোলমাল হয়। ওপরতলাটা একদম ঠান্ডা।
পারমিতার পার্সে অনেক টাকা। পারুলের হাত থেকে সেটা নিয়ে সে নোটগুলোর মধ্য থেকে দুটি পঞ্চাশ টাকার নোট টেনে বার করল।
তোর মাইনে চল্লিশ টাকা। তোকে আমি–
ও কি দিদিমনি, এখন মাইনে দিচ্ছ?
অর্থাৎ আজ মাসের উনত্রিশ তারিখ, এখনো মাস ফুরোয় নি। প্রতি মাসের মাঝামাঝি পারুল কিছু টাকা অগ্রিম চেয়ে নেয়, মাস শেষ হলেই আবার চায়।
তোকে আমি দু'মাসের মাইনে দিয়ে দিচ্ছি। আশি টাকা। আরও কুড়ি টাকা বেশি দিচ্ছি! এই একশো টাকা নে।
এত টাকা দিচ্ছ কেন, দিদিমনি?
তুই যে অনেকগুলো মিথ্যে কথা বললি, তার পুরস্কার। তোকে আর আমার এখানে কাজ করতে হবে না পারুল। তুই বাড়ি যা।
দিদিমনি....তুমি আমায়–
আমার যে শাড়ি দুটো আর ব্লাউজ কাচছিলি, সেগুলোও আর এখানে কাচতে হবে না। সেগুলোও সব নিয়ে যা তুই। ঐ ভিজে অবস্থাতেই পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যা।
দিদিমনি, তুমি আমায় ছাড়িয়ে দিচ্ছ?
হ্যাঁ।
আমি কোনদিন চুরি করি নি, জোচ্চুরি করি নি, ঠাকুরের কাছে হরপ্ করে বলতে পারি,

তোমার একটা পয়সাও...

আমি কি তোর নামে সে-রকম দোষ দিয়েছি?

তবে আমায় ছাড়িয়ে দিচ্ছ কেন?

কেউ মিথ্যে বললে আমার বড় কষ্ট হয়। আমার গায়ে যেন বিষের হাওয়ার ঝাপটা লাগে। তোকে আমি কতবার বলেছি–

আমার দোষ হয়ে গেছে, দিদিমনি, আর বলব না।

না, তোর দশটা দোষ আমি ক্ষমা করব ঠিক করে রেখেছিলুম। দশটার অনেক বেশি হয়ে গেছে।

আমি আর কি দোষ করেছি?

তুই আমার সাদা গোলাপ গাছটার দুটো ফুল ছিঁড়েছিস। ছিঁড়িসনি? ও গাছটার ফুল আমিও কোন দিন ছিঁড়ি না...তুই নিচতলার বাহাদুরকে একদিন খারাপ গালাগালি দিয়েছিলি–

ও-ও আমায় দিয়েছিল।

তুই কি যেন বলেছিলি? হারামী, তাই না? ও তোকে কি বলেছিল?

সে আরও খারাপ কথা। তোমার সামনে বলা যাবে না।

কেন বলা যাবে না? আমি সব শুনতে পারি! বল্, কী বলেছিল?

সে আমি মুখে আনতে পারব না।

হারামী বুঝি মুখে আনা যায়? যাক্‌গে, তোকে আর আমি ফিরিস্তি শোনাতে চাই না, টাকা দিয়ে দিয়েছি, তুই বাড়ি যা।

পারুল একটুক্ষণ গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঝাঁঝালো গলায় বলল, ঠিক আছে, রাখবে না, রাখবে না! আমার কি কাজের অভাব! তোমার খাবারটা দিয়ে যাচ্ছি।

না, তোকে খাবার দিতে হবে না, আমি নিজেই নিয়ে নেব!

এঁটো বাসন তুমিই মাজবে?

হ্যাঁ।

কেন এমন মিছিমিছি রাগ করছ, দিদিমনি? এমন কিছু ঘাট হয় নি আমার। আমায় তাড়িয়ে দিয়ে তুমি রাত্তিরবেলা এই নিঝুম পুরীতে একলা থাকবে?

হ্যাঁ থাকব, তাতে কী হয়েছে?

বড়বাবু তোমায় একলা থাকতে মানা করেছিলেন। আমায় বলেছিলেন, রোজ রাতে আমি যেন তোমার কাছে এসে শুই।

বড়বাবু তো পাগল! তাঁর কথার কী দাম আছে?

তোমার ঠাকুরঘরে একবার পা দিয়েছি বলেই তোমার এত রাগ! কী আছে তোমার ঠাকুরঘরে? ঠাকুর–দেবতা নেই, কিছু নেই, সেখানে আমি একবার ঢুকতেই সব অশুদ্ধ হয়ে গেল? আমিও কায়েতের মেয়ে–

কেন চ্যাঁচাচ্ছিস, পারুল? তুই তো জানিস, আমি চ্যাঁচমেচি একদম সহ্য করতে পারি না।

আমি তাহলে চলে যাব?

হ্যাঁ।

তোমার পায়ে পড়ছি, দিদিমনি! এবারকার মত ছেড়ে দাও, আর তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলব না।

তোকে তো এক মাসের বেশি টাকা দিলুম। এই এক মাস দ্যাখ, যদি বুঝিস যে সত্যিই তুই মিথ্যে কথা বলা বন্ধ করতে পারবি, তখন আসিস। আমি আবার তোকে রাখব।

পারুল তবু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। পারমিতা আর কোন কথা বলছে না দেখে সে

সন্দেশের বাক্সটা নিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

পারমিতা বলল,বাথরুম থেকে কাপড়গুলো নিয়ে গেলি না? ওগুলোও নিয়ে যা, আমার আর দরকার নেই।

সব নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতেও পারুলের মুখে গভীর বিস্ময়ের ভাব লেপটে রইল। এখনো সে কিছুই বুঝতে পারছে না। এত সামান্য কারণে কেউ ছাড়িয়ে দেয়? দিদিমনি কোন দিন খারাপ ব্যবহার করেন না, খাবার দাবার বেশি করে দেন, পয়সাকড়ির হিসেব নেই, শুধু দুটো একটা মিথ্যে কথার জন্য এত! পাঁচ বছরের কাজ এইভাবে খতম!

ছাদের ঘরটার কী রহস্য আছে? প্রথম দিন থেকেই দিদিমনি বারণ করে দিয়েছিলেন। বারণ করলেই বেশি করে জানবার ইচ্ছে হয়। শুধু আজ একবার নয়, এর আগেও কয়েকবার ঐ ঘরে চুপি চুপি ঢুকে দেখেছে পারুল। ঐ ঘরটাকে দিদিমনি পূজোর ঘর কেন বলেন? কোন ঠাকুর-দেবতার মূর্তি নেই, পট নেই, ছবি নেই, কিচ্ছু না। এমনি একটা খালি, সাদা ঘর। এ রকম কখনো পূজোর ঘর হয়? সকালে আর রাত্তিরে রোজ প্রায় এক ঘন্টা ধরে ঐ ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে দিদিমনি কী করেন?

ঘরটায় কয়েকটা দেয়াল আলমারি আছে। তালা বন্ধ। তবে কি ওরই মধ্যে কিছু আছে? কিন্তু খুব দামি জিনিস হলে ঐ ছাদের ঘরেই বা কেন রাখা হবে? দিদিমনির শোবার ঘরেই তো ষ্টিলের আলমারি আছে দুটো।

কিছু বুঝতে পারেনি বলেই ঐ ঘরটা সম্পর্কে পারুলের এত কৌতূহল।

রাস্তা পার হতে পারুল আপন মনে বলল, পাগল! দিদিমনিটা পাগল ছাড়া আর কী! সাধে কি আর ওর বর ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে!

খানিকক্ষণ বারান্দায় চুপ করে বসে থাকবার পর পারমিতা উঠে গেল তার শোবার ঘরে। এটা একসময় তার মায়ের ঘর ছিল। দেয়ালে মায়ের ছবি। বিছানার পাশে একটা ছোট টেবিলে কিছু বইপত্র আর টেলিফোন। টেলিফোনের রিসিভারটা পাশে নামিয়ে রাখা।

এক একদিন পারমিতার ইচ্ছে হয় বাইরের কারুর সঙ্গে কথা বলবে না। সেই সব দিন সে টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখে, যাতে বাইরের কোন কল না আসে।

এবার সে রিসিভারটা হাতে তুলে নিতেই ডায়াল টোন পেল। তখন সে নম্বর ঘোরাতে লাগল তার অফিসের।

পারমিতা কোন সাধারণ অফিস-চাকুরে নয়। সে একটি বড় চা-বাগানের অনেকখানি শেয়ার হোল্ডার। সেই হিসেবে ঐ চা-বাগানের কলকাতার অফিসের সে অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টার। ইনজের অংশের স্বার্থ দেখাবার জন্য সে অফিসে যায়।

মিঃ মজুমদার? আমি পারমিতা বলছি।

হ্যাঁ, বলুন মিসেস নাগচৌধুরী, আজ একটা মিটিং আছে।

আমি আজ অফিসে যাব না।

ওপাশ থেকে মজুমদার যেন আরও কী সব বলছিল। কিন্তু পারমিতা আর একটি কথাও উচ্চারণ না করে লাইন কেটে দিল।

একজন মাত্র মানুষ ছাড়া পারমিতা আর কারুর সঙ্গে টেলিফোনে দুটির বেশি বাক্য বলে না।

এবারও সে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল পাশে।

বেলা এগারোটার মধ্যে তার খেয়ে নেওয়া অভ্যেস। পারুল ভাত ডাল রান্না করে রেখেছে। পারমিতা খেতে বসলে সে গরম গরম মাছ ভেজে দেয়।

রান্নাঘরে গিয়ে পারমিতা ভাত-ডাল আলু সেদ্ধ দিয়ে খাওয়া সেরে নিল। তারপর বানালো এক কাপ কফি। পারমিতার মুখে একটুও কুঞ্চন নেই। সম্পূর্ণ নিরালায় সে কোনই

অস্বস্তি বোধ করছে না।

দোতলার সিঁড়ির মুখের কোলাপসিবল গেটে তালা দিয়ে এসে পারমিতা বিছানায় শুয়ে পড়ল হাতে একটা গ্রন্থাবলী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলো সে আবার পড়তে শুরু করেছে।

টানা দু'ঘন্টা পড়বার পর সে বইটা পাশের টেবিলে রেখে দিয়ে ঘুমোল।

বিকেলে তার ঘুম ভাঙল গেট ঝাঁকানোর শব্দে। ধোপা এসেছে। অন্যদিন পারুল এই সব লোকের কাছ থেকে জিনিসপত্র বুঝে নেয়। আজ পারমিতাই উঠে এলো। একটু বাদে এলো মুড়িওয়ালা। একটা সংসার চালাতে গেলে এই সব উপসর্গ থাকবেই। পারুলের বদলে আর একজন কারুকে রাখতে হবে। কিন্তু কী করে যে কাজের লোক জোগাড় করতে হয় তা পারমিতা জানে না।

দু'কাপ চা বানিয়ে বারান্দায় বেতের টেবিলে রেখে একটা চেয়ারে বসল পারমিতা।

দু'কাপ চা ঢালা, যেন আর একজন কেউ আসবে।

অন্য চায়ের কাপটিকে উদ্দেশ্য করে পারমিতা বলল, খুব ব্যস্ত? চা খাওয়ারও সময় নেই বুঝি?

চায়ের কাপটি থেকে ধোঁয়া উঠছে। সেই ধোঁয়ায় পারমিতা যেন দেখতে পাচ্ছে কারুর মুখ!

খুব গরম ওখানে, তাই না? দেখ, কলকাতায় আজ বিকেলে কী সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া দিয়েছে। এই সময় ছাদে বসলে–

কথাটা মনে পড়ে যেতেই পারমিতা চায়ের কাপ দুটি নিয়ে উঠে এলো ছাদে। পুজোর ঘরের সিঁড়িতে বসে আবার বলল, দেখ, এখানে হাওয়ায় কী সুন্দর গন্ধ! কত রকম ফুল ফুটেছে। আমার যুঁইগাছটায় কুঁড়ি এসেছে। ঐ কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটবে। তারপর ঝরে পড়বার আগেই তুমি আসবে তো? নইলে কিন্তু দেখতে পাবে না।

নিজের চায়ের কাপে একটা চুমুক দিল পারমিতা। তারপর অন্য কাপটি তুলে বলল, নাও, তুমিও একটু খাও! আমি দিচ্ছি, লক্ষীটি খাও!

এই সময় আড়াল থেকে কেউ দেখলে পারমিতাকে নিশ্চয়ই পাগল ভাববে।

এই রকম কথা বলতে বলতে চা শেষ করে পারমিতা উঠে গেল ফুলের টবগুলোর কাছে। প্রত্যেক গাছের সঙ্গেই সে কথা বলতে লাগল।

ওগো, গোলাপবালা, কেমন আছ? আজ মন খারাপ নেই তো?

টগর, টগর, তুমি মুখ ফিরিয়ে আছ কেন? আমার দিকে একটু চাও!.....

শ্বেতজবা, তুমি আজই শুকিয়ে যেও না। আর একদিন থাকো–

ইস্ তোমার কী গর্ব, ঝুমকো ফুল। তুমি নিজেকে সবার চেয়ে সুন্দরী মনে কর, তাই না? সত্যি তুমি সুন্দর...

নিচতলায় ফুড কর্পোরেশানের অফিস ছুটি হয়ে গেলে সারা বাড়িটাই একেবারে নির্জন হয়ে যায়। ওদের অফিস পাহারা দেবার জন্য দুজন নেপালী দরোয়ান আছে। তারা দুজন এতই কম কথা বলে যে তাদের অস্তিত্বও টের পাওয়া যায় না। তবে মাঝরাতে শোনা যায় তাদের লাঠির শব্দ। ওরা সারা রাত জেগে পাহারা দেয়।

পারমিতাও মাঝরাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকে তার পূজোর ঘরে। তার পূজো মানে শুধু চোখ বুজে বসে থাকা। ধ্যানের মতন।

।।দুই।।

মনীশ উঠেছে বান্দ্রার এক হোটেলে, সারাদিন তাকে চার্চগেট থেকে সান্টাক্রুজ ওয়েস্ট পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে হয়। বোম্বাইতে ট্যাক্সি খরচ সাংঘাতিক, কিন্তু কাজের তাড়ার জন্য তার ট্যাক্সি না নিয়ে উপায় নেই।

বোম্বাইতে মনীশের ছোট মাসীরা থাকেন। বন্ধু-বান্ধবও আছে বেশ কয়েকজন। কিন্তু কারুর সঙ্গেই সে দেখা করার সময় পায় নি। ছোট মাসীদের জন্য তার মা পাঠিয়েছেন একটা শাড়ি, দু' কৌটো কাসুন্দী আর বাচ্চাদের জন্য জামা-টামা। সেগুলোও পৌঁছে দেওয়া হয়নি এখনো। মা বারবার বলে দিয়েছিলেন, তোর ছোট মাসীর বাড়িতেই উঠিস। নইলে সে জানতে পারলে খুব রাগ করবে।

কিন্তু মনীশ তবু ওঠেনি সেখানে। অফিসের কাজে এসে কোন আত্মীয় -বন্ধুর বাড়িতে ওঠা সে পছন্দ করে না। তাদের বাড়িটাকে বিনা পয়সায় হোটেলের মতন ব্যবহার করবে কেন সে, কোম্পানি তো তার হোটেল ভাড়া দেবেই!

মেরিন ড্রাইভে মনীশের চলন্ত ট্যাক্সির পাশাপাশি আর একটি ট্যাক্সি থেকে কে যেন ডাকল, মনীশ! মনীশ!!

মনীশ তাকিয়ে দেখল সুতপাদি আর তার সঙ্গে দুজন অচেনা ভদ্রলোক।

সুতপাদি খুব উত্তেজিত ভাবে হাত নাড়ছেন, সুতরাং মনীশ ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, গাড়ি থামাতে।

সুতপাদির ট্যাক্সিটাও একটু এগিয়ে থামল। তার থেকে নেমে এসে সুতপাদি বললেন, কী ব্যাপার, মনীশ! কখন থেকে তোমায় ডাকছি, শুনতে পাচ্ছ না? এখানে কবে এসেছ?

এই দিন তিনেক আগে।

ঠিক আছে। তোমার কথা পরে শুনব। তোমার ট্যাক্সিটা ছেড়ে দাও, আমাদের সঙ্গে চল।

কিন্তু সুতপাদি–

খুব জরুরি ব্যাপার। এখানে সময় নষ্ট করা চলবে না। তোমাকে ভাগ্যিস পেয়ে গেলাম। আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি, রমেনের সাঙ্গাতিক অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

কোথায়? কী অ্যাকসিডেন্ট?

মোটরবাইকে যাচ্ছিল.. ভিলে পার্কের ওদিকটায় একটা ট্রাকের সঙ্গে....

রমেন সুতপাদির ছোট ভাই, মনীশের সহপাঠী।

সহপাঠীর দুর্ঘটনার কথা শুনলে নিশ্চয়ই তক্ষুণি দেখতে যাওয়া উচিত। কিন্তু এখন বাজে রাত পৌনে ন'টা, ঠিক ন'টার সময় সেন্টার হোটেলে দুজন গুজরাটি ভদ্রলোককে মনীশের ডিনার খাওয়াবার কথা। তাঁরা সেখানে অপেক্ষা করবেন। খুব সম্ভবত এতক্ষণ তাঁরা সেখানে পৌঁছে গিয়ে ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়েছেন। মনীশ যদি সেখানে উপস্থিত না হয় তাহলে গুজরাটি ভদ্রলোক দুজন যে রেগে লাল হবে তা খুবই স্বাভাবিক। অথচ ঐ দুজন ভদ্রলোককে খুশি করবার জন্যই তার কোম্পানি তাকে অনেক টাকা দিয়ে বোম্বাই পাঠিয়েছে। ওদের রাগালে একটা বিরাট অর্ডার ফস্কে যেতে পারে।

দ্রুত চিন্তা করে নিয়ে মনীশ বলল, কোন্ হাসপাতাল সুতপাদি? আমি একটু পরেই আসছি।

এখন যেতে পারবে না?

দুজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন, তাঁদের বলেই চলে আসবো।

সুতপাদি হাসপাতালের নাম বলে কয়েক পলক তাকালেন মনীশের চোখের দিকে। তারপর ফিরে গেলেন নিজের ট্যাক্সিতে।

সুতপাদির দৃষ্টির মধ্যে কি ধমক ছিল? মনীশ কেন রমেনের দুর্ঘটনার কথা শুনেই লাফিয়ে উঠল না? সব কথা সসবাইকে বোঝানো যায় না। দুজন লোক মনীশের কোম্পানির পয়সায় মদ খাবে বলে বসে আছে পাঁচতারা হোটেলে। আর মনীশের বন্ধু দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে হয়তো লড়াই করছে মৃত্যুর সঙ্গে। যে কেউ শুনে বলবে, মনীশের আগে হাসপাতালেই যাওয়া উচিত। কিন্তু জীবন এই নিয়মে চলে না।

মনীশ যা ভেবেছিল ঠিক তাই। তার পৌছতে একটু দেরি হয়েছে, তার আগেই সেই ভদ্রলোক দুজন মদ ও খাবারের অর্ডার দিয়ে ফেলেছেন। গুজরাটি ভদ্রলোক দুজন বাড়িতে নিরামিষাশী, কিন্তু হোটেলে চুটিয়ে মাংস খান। তাদের সামনে একটি প্লেটে শুধু মুরগীর ঠ্যাং আটখানা! এই হোটেলে শুধু ঐ এক প্লেটের দাম চৌষট্টি টাকা!

মনীশ আসতে আসতে ভেবেছিল যে আগেই সে হোটেলের কাউন্টারে গিয়ে একহাজার টাকা জমা দিয়ে বলবে, ঐ ভদ্রলোক দুজন যা যা খেতে চান সবই যেন দেওয়া হয়। তারপর সে ওঁদের দুজনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় নিয়ে হাসপাতালে ছুটবে।

প্রথমে সে কাউন্টারে একহাজার টাকা জমা দিল ঠিকই কিন্তু তারপর তাকে দেখা মাত্রই ভদ্রলোক দুজন এমন উচ্ছাস প্রকাশ করলেন যে তক্ষুণি সে বিদায় নেবার প্রস্তাবটি দিতে পারল না। সেজানে আনন্দ ফুর্তির সময় শোক-দুঃখের কথা কেউ পছন্দ করে না। রমেনের জন্য মনীশ দুঃখিত হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক দিনই অ্যাকসিডেন্টে কত লোক মারা যাচ্ছে, সুতরাং সে-রকম একটা খবর শুনে গুজরাটি ভদ্রলোক দুজন দুঃখিত হবে কেন?

তাছাড়া গুজরাটি ভদ্রলোক দুজন তো শুধু খেতে আসেননি। তারা নিজেরাও যথেষ্টর চেয়েও বেশি ধনী। কাজের কথা আলোচনা করার জন্যই মনীশ তাদের এই সেন্টার হোটেলে ডেকেছে। মনীশ যদি কাজের কথা না বলেই চলে যেতে চায়, তাহলে ওরা যদি বলে ওঠেন– আমরা কি তোমার পয়সায় খেতে এসেছি এখানে?

তখন মনীশ ভাবল, এক ঘন্টা দেরি করে গেলেই বা কী আর এমন হবে। সুতপাদির সঙ্গে তো তার এক ঘন্টা পরেও দেখা হতে পারত! কিংবা দেখা না হতে পারত!

গুজরাটি ভদ্রলোক দুজনকে সঙ্গ দেবার জন্য মনীশকেও মদের অর্ডার দিতে হল। শিবপুরে পড়বার সময় রমেন ছিল হোস্টেলে মনীশের রুম-মেট। রমেনদের বাড়ি সিউড়ি। সেখানে মনীশ দু-তিনবার গেছে, অনেকদিন থেকেছে। সেই রমেন এখন হাসপাতালের খাটে শুয়ে আছে।

এক ঘন্টা নয়, সওয়া দু'ঘন্টা বাদে মনীশ উঠতে পারল। সেখান থেকে হাসপাতালটা ট্যাক্সিতে আবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

মনীশ এসে দেখল, পুরো হাসপাতালটা কেমন যেন শুনশান। কোথাও কোন শব্দ নেই, সবাই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। সামনের এনকোয়ারি কাউন্টারটা ফাঁকা। সুতপাদি কিংবা তাঁর সঙ্গের লোক দুটোরও কোন চিহ্ন নেই।

মনীশের বুকটা ধক্ করে উঠল।

একটু বাদে একজন হাউস ডাক্তারকে দেখে সে উত্তেজনা দমন করে জিজ্ঞেস করল, মিঃ রমেন মজুমদারের কোন খবর দিতে পারেন?

তরুণ ডাক্তারটি বললেন, মজুমদার.....ও আই অ্যাম সরি....

ডাক্তারটির কথা ও মুখভঙ্গি দেখে একটাই মানে বোঝা যায়।

সুতপাদির সঙ্গে মনীশের মাঝরাস্তায় দেখা হয়েছিল নাটকীয় ভাবে। এটা যদি নাটক হত তাহলে মনীশের বিবেকযন্ত্রণা আরও গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলবার জন্য নাট্যকার নিশ্চয়ই এখানে রমেনের মৃত্যু সংবাদ দিতেন।

কিন্তু জীবন নাটকের নিয়মে চলে না।

মাজুমদার নয় মুজুমদার। মারাঠীদের পদবী হয় মজুমদার। তরুণ ডাক্তারটি ভুল লোকের কথা ভেবেছিলেন। একটু পরেই জানা গেল যে রমেন মজুমদার বেঁচেই আছে এবং মোটামুটি ভাল আছে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, এখন আর তার সঙ্গে দেখা হবে না। সুতপাদিরা একটু আগে বাড়ি চলে গেছেন। সুতপাদি বোম্বেতে কোথায় থাকেন, মনীশ তা জানে না। তাড়াতাড়িতে জিজ্ঞেস করাও হয়নি।

সুতরাং মনীশকে হোটেলে ফিরতে হল। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা।

হোটেলে মনীশের নিজের কাছে একটা মদের বোতল থাকে। শোওয়ার আগে মদ খেতে মনীশের ভাল লাগে না। অথচ উপায় নেই। এটাই তার জীবিকা। বাথরুমে ঢুকে ভাল করে স্নান সেরে মনীশ সারাদিনের গ্লানি মুছে ফেলল শরীর থেকে। হোটেলের জানালা থেকে সমুদ্র দেখা যায়, কিন্তু পুরীর মতন এখানকার সমুদ্র থেকে হু-হু করে হাওয়া আসে না। নতুন কাচা গেঞ্জি ও পাজামা পরে মনীশ বসল বিছানায়। গেলাসে মদ ঢেলে রাখল সে পাশের ছোট টেবিলটায়। সারাদিন খবরের কাগজটাও পড়া হয়নি। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে কাগজটা তুলে নিল।

গেলাসটি অর্ধেক শেষ করার আগেই ঘুমে চোখ ঢুলে এলো মনীশের। আলো জ্বালাই রইল। বালিসে ঠেসান দেওয়া আধ শোওয়া অবস্থাতেই সে তার ঘুম তলিয়ে গেল।

প্রায় ঘন্টা খানেক ঐ ভাবে থাকবার পর কে যেন তার কানের কাছে ফিসফিস করে ডাকতে লাগল–মনীশ! মনীশ!!

কয়েকবার এরকম হবার পর মনীশ চোখ মেলে তাকাল। কে ডাকছে তাকে?

ঘুমের ঘোর ভাল করে কাটবার পর মনীশ ধড়মড় করে উঠে বসল। তখনো সে তার কানের পাশে ডাক শুনতে পাচ্ছে। কোন নারীকণ্ঠ!

–মনীশ, চুপ করে বসে আছ কেন? তোমার কার্পেটে আগুন!

মনীশ এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দেখল সাংঘাতিক ব্যাপার। ঘুমোবার মুহূর্তে তার হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট খসে পড়েছে মেঝেতে, সেখানকার কার্পেটে অনেকখানি পুড়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ছুটে বাথরুমে গিয়ে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে মনীশ সেই ধিকি ধিকি আগুনের ওপর চাপা দিল। সহজে সেই আগুন নেভে না। বেশ কয়েকবার তোয়ালে ভিজিয়ে আসতে হল মনীশকে। তারপর দেখা গেল, আফ্রিকার ম্যাপের মতন চেহারায় অনেকখানি জায়গা পুড়ে গর্ত হয়ে গেছে কার্পেটে।

বিশ্রী দেখাচ্ছে বলে সেখানে একটা খবরের কাগজ চাপা দিয়ে রাখল মনীশ। কিন্তু ওভাবে গোপন রাখা যাবে না, কাল সকালে জমাদার এলেই ধরা পড়ে যাবে। কার্পেটের যদি দাম চায়? কত দাম হবে এই কার্পেটের!

মনীশ পরীক্ষা করে দেখল। আসল পশমী কার্পেট নয়, এটা জুট কার্পেট। মাঝারী দামের হোটেলে আর কি কার্পেট দেবে!

কিন্তু কার্পেটের দামের চেয়েও বড় কথা, মনীশের ঘুম না ভাঙলে যদি সারা ঘরে আগুন লেগে যেত? কে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল? ঠিক যেন এক নারী তার কানের কাছে তার নাম ধরে ডাকছিল! এ রকম কখনো হয়? কিংবা তারই অবচেতন মন তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। এরই নাম অটো সাজেশান।

সারা রাত আর ভাল করে ঘুম এলো না মনীশের।

পরদিন সকালে মনীশ খবরের কাগজটা সরিয়ে দেখল কার্পেটের পোড়া জায়গাটা। সারা বছরে বেশ কয়েকবার তাকে এ রকম হোটেলে থাকতে হয় একা। আগে কখনো এ রকম হয়নি। কাল সারাদিন ঘোরাঘুরি করে সে খুবই ক্লান্ত ছিল।

যাই হোক, এখন আর ওসব নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। সাড়ে আটটার মধ্যে তাকে দেখা করতে হবে একজন শিল্পপতির সঙ্গে। দ্রুত বাথরুম সেরে দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে মনীশ তৈরি হয়ে নিল। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় নেই।

কার্পেট বিষয়ে হোটেলের ম্যানেজার কী বলে তা রাত্রে শোনা যাবে। নতুন সুট পরে, টাই বেঁধে মনীশ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তালা লাগাল। চাবিটা হোটেলের অফিস-কাউন্টারে ছুঁড়ে দিয়ে সে তরতরিয়ে নিচে নেমে এসে হাঁক দিল, ট্যাক্সি!

ট্যাক্সিতে উঠে সে তার গন্তব্যের কথা বলতে যাবে, এমন সময় তার কানের পাশে সেই

নারীকণ্ঠ বলে উঠল– মনীশ! মনীশ! তুমি আগে রমেনকে দেখতে যাবে না? রমেন হাসপাতালে আছে....কাল তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি....।

মনীশের সারা শরীর কেঁপে উঠল বেশ জোরে।

। । তিন । ।

কোলাপসিবল দরজায় খুব জোর ঝাঁকানি শুনে বেরিয়ে এলো পারমিতা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে সুব্রত। চুল এলোমেলো। বুশ শার্টটা বুকের কাছে মোচড়ানো। চোখ দুটো লাল। এখন রাত ন'টা।

পারমিতা এই সময় তার অল ওয়েভ রেডিওর কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনুষ্ঠান শোনে। এমন কি চীনে ভাষায় কোন গান, যার কিছুই সে বুঝতে না পারলেও শোনে বেশ মন দিয়ে।

দরজা খোল। ভয় নেই, তোমার কাছে টাকা চাইতে আসিনি।

পারমিতা কোন উত্তর না দিয়ে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়িতে আর কেউ নেই বলে সন্ধ্যের পর সে একটা ড্রিসিং গাউন পরে থাকে। তার মুখখানি শান্ত, সুব্রতকে দেখে সে যেন একটুও অবাক হয়নি।

তোমায় টেলিফোন করলেও কিছুতেই পাওয়া যায় না। লাইন-ফাইন কেটে দিয়েছ নাকি?

পারমিতা তবু নিরুত্তর।

বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ আমার কাছে অনেক টাকা আছে। আমি তোমার দয়া চাই না। প্যান্টের পকেট থেকে একটা মানি ব্যাগ বার করে সুব্রত খুলে দেখায়। তার মধ্যে দু-তিনশো টাকা আছে।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কি? দরজাটা খোল? তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

সুব্রত এমন ভাবে লোহার গেটটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে এক কারাগারের বন্দী। গেটের এ পাশে পারমিতা দাঁড়িয়ে আছে দু'হাত দূরে।

পারমিতা এবারে খুব শান্তভাবে বলল, বাড়ি যাও, সুব্রত। আবার কেন এসেছ?

বেশ করেছি! আমার যতবার খুশি আসব! দরজাটা খুলে দাও, আমি....আমি একটু বাথরুমে যাব।

নিজের বাড়িতে যাও।

তুমি আমায় ঢুকতে দেবে না?

তুমি খুব ভাল করেই জানো.....

ফের পাগলামি করছ? বলছি না জরুরি কথা আছে? মিতা, তোমার কাছে আমি এমনি এমনি আসিনি। কাজ আছে বলেই এসেছি।

ঐখান থেকেই বল।

তুমি আমায় ভেতরে গিয়ে বসতেও দেবে না! মিতা তোমার পাগলামি দিন দিন বাড়ছে।

আমি তো পাগলই। সবাই জানে।

নিশ্চয়ই পাগল! তোমার বাবাও পাগল! তিনি জেনে শুনে একটা পাগল মেয়ে গুছিয়ে দিয়েছিলেন আমার ঘাড়ে।

পারমিতা পিছন ফিরে চলে গেল নিজের শোবার ঘরে। যাবার সময় বারান্দার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গেল।

চরম অপমানিত হয়ে সুব্রত প্রচন্ড ঝাঁকানি দিতে লাগল গেটে। চিৎকার করে বলতে লাগল, ভাল হবে না বলছি! শিগগির আমায় আসতে দাও। নইলে গেট ভঙে ফেলব।

মিনিট পাঁচেক ধরে চলল এই রকম।

অন্য কেউ এ রকম হামলা করলে নেপালী দারোয়ান দুজন ছুটে আসত নিচ থেকে।

কিন্তু তারা সুব্রতকে ঢুকতে দেখেছে। তারা সুব্রতকে চেনে।

এরপর সুব্রত বসে পড়ল সিঁড়িতে। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল।

প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগল, মিতা, তুমি আমাকে এ রকম দূর দুর করে তাড়িয়ে দেবে? আমি একবার ভুল করেছি বলে আর আমি তোমার কেউ নই? আমি তোমার সন্তানের বাবা নই? বিল্টু কি তোমার আর আমার দুজনের নয়? মিতা, আমার এত জলতেষ্টা পেয়েছে যে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, আর তুমি আমাকে রাস্তার কাঙালীর মতন...

এবার পারমিতা আবার বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বারান্দার আলো জ্বলল, ফ্রিজ থেকে বোতল বার করে একটা গেলাসে জল ঢেলে নিয়ে এলো গেটের কাছে। ফাঁক দিয়ে গেলাসটা বার করে সে বলল, এই নাও, জল।

সুব্রত পারমিতার গেলাস শুদধু হাতটা চেপে ধরে গভীর শোকার্ত গলায় বলল আমি খাব না, জল খাব না, তুমি গেট না খুললে আমি জল খাব না।

তার মানে তোমার জলতেষ্টা পায়নি। কেন এ রকম ছেলেমানুষী করছ? বাড়ি চলে যাও।

না, যাব না। জানি, আমি মদ খেয়েছি বলে তুমি আমায় ঘেন্না করছ। তুমি যদি গেট না খোল, আমি সারারাত এখানে বসে থাকব।

আমার হাতটা ছাড়।

না ছাড়ব না। কেন, আমি অস্পৃশ্য? আমি ছুঁলে এখন তোমার ঘেন্না হয়?

হাত ছাড়, গেট খুলছি।

ফ্রিজের ওপরেই চাবি থাকে। পারমিতা গেট খুলতেই সুব্রত চলে গেল বাথরুমে। তারপর ফিরে এসে প্রায় একনিশ্বাসে শেষ করল জলের গেলাস। একটা সিগারেট ধরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে অ্যাসট্রে খুঁজল। কাঠিটা ফেলবার জন্য। তারপর সেটা মেঝেতেই ছুঁড়ে ফেলে বলল, সত্যি তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে, মিতা।

আমার তো কোন কথা নেই, তোমার সঙ্গে। আমি কিছু শুনতেও চাই না।

মিতা, তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পারবে না কিছুতেই? একবার আমি ভুল করেছি বলেই.....

ক্ষমার তো কোন প্রশ্ন নেই। তুমি আলাদা, আমি আলাদা।

সুব্রত ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল। মুখখানা তার দারুণ বিমর্ষ। আপন মনে বলতে লাগল, হ্যাঁ, ভুল করেছি, চরম ভুল, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু আমি যদি সত্যিই কোন পাষন্ড হতাম, তোমার কাছে বার বার এ রকম ফিরে ফিরে আসতুম না। তুমি ভাবো, আমি বুঝি তোমার টাকার লোভে আসি। আমি কি এত নীচ?

মাটিতে বসে অভিমানী শিশুর মতন মাথা ঝাঁকাতে লাগল সুব্রত।

দিনের বেলা কেউ সুব্রত মজুমদারকে দেখলে তার এখনকার এই ব্যবহারের সঙ্গে একেবারেই মেলাতে পারবে না। সুব্রত মজুমদার একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার। সম্মানজনক চাকরি করে, তার ব্যবহারও অতি ভদ্র।

এক সময় এই সুব্রত ছিল পারমিতার স্বামী। ওদের ছেলে বিল্টু অর্থাৎ সব্যসাচী পড়ে পুরুলিয়ার সৈনিক স্কুলে। প্রত্যেক মাসে একবার পারমিতা তাকে দেখতে যায়।

সুব্রত আবার বিয়ে করেছে। তার দ্বিতীয়া স্ত্রী অরুণিমা খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে, একটি স্কুলে পড়ায়, তারও একটি মেয়ে হয়েছে।

পারমিতার সঙ্গে সুব্রতর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে পারস্পরিক সম্মতিতে। কোন তিক্ততার সৃষ্টি হয়নি। এমনকি সুব্রতর সঙ্গে অরুনিমার বিয়ের সময় পারমিতা একটা দামী শাড়ি উপহার পাঠিয়েছিল। এরকম তো হয়ই আজকাল।

সুব্রত মজুমদার মাতাল নয়, নিয়মিত মদ্যপানও করে না। মদ সহ্য হয় না তার। কিন্তু

তিন চার মাস অন্তর হঠাৎ এক একদিন কী হয়, সে হঠাৎ বেশ খানিকটা গিলে ফেলে, অমনি তার মাথার মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। সেই সব দিনেই সে শুধু পারমিতার কাছে ক্ষমা চাইতে ছুটে আসে।

সাত বছর যারা একটানা দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছে , আজ তাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক দূরত্ব।

মিতা, আমায় দুধ-চিনি ছাড়া এক কাপ কড়া কফি বানিয়ে দেবে?

দিতে পারি । কিন্তু তুমি বাড়ি চলে গেলেই ভাল করতে। শুধু শুধু দেরি করছ, অরুণিমা চিন্তা করবে।

অরুণিমা তোমার মতন এত চিন্তা করে না। তার ঠান্ডা মাথা। ইস্কুল মাষ্টারনী তো, আমার ওপরেও মাস্টারী করে!

ছিঃ সুব্রত।

তুমি কফি দেবে না?

দিতে পারি। খেয়েই তুমি চলে যাবে তো?

পারমিতা রান্নাঘরে ঢুকে গ্যাস জ্বেলে কেট্‌লি চাপাল। সুব্রত এসে দাঁড়াল তার পাশে।

তুমি নিজে বানাচ্ছ? যে মেয়েটি তোমার রান্না করে দেয়, সে কোথায়?

সে নেই।

তুমি একদম একলা থাক? দূর! এর কোন মানে হয়? এরকমভাবে কোন মেয়ে থাকতে পারে! তুমি পাগলামি করছ।

আমি তো পাগলই!

আই অ্যাম সরি, মিতা! একদম একলা...তোমার প্রেমিকরা কেউ আসে না।

তুমি বাইরে বারান্দায় গিয়ে বস। আমি কফি নিয়ে যাচ্ছি।

সুব্রত পারমিতার কাঁধে হাত রাখল।

মুখ ঘুরিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল পারমিতা। সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিয়ে লাজুক ভাবে হেসে বলল, তুমি ভাবছ, মাতাল হয়ে গেলে আমার কান্ডজ্ঞান থাকে না। কিন্তু তোমার জন্যই আমি মাতাল হই-মিতা, তোমার ওপরে আমার কি আর কোনই অধিকার নেই?

না!

তা তো ঠিকই! আমি নিজেই সব নষ্ট করেছি; তবু.....তুমি কি বিশ্বাস করবে যে আমি তোমাকে এখনও....

ভালবাস এই তো? কিন্তু আমি তোমার ভালবাসা চাই না। আমার মনে এমন কোন ফাঁকা জায়গা নেই, যা তোমার ভালবাসার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।

ও, অন্য কারুর ভালবাসাতেই তোমার মনটা ভরে আছে।

তুমি পুরুষ মানুষ। তাই তুমি এখন আমার ওপরে তোমার অধিকার দেখাতে চাও। নইলে, আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তোমার তো কোন কৌতূহল দেখান এখনো উচিত নয়।

অধিকার নয়, আমি এখনও তোমার ভাল চাই। তোমার যাতে কোন বিপদ না হয়। তুমি এ রকম একলা একলা থাক-

কাপে গরম জল ঢেলে, তাতে কফি মিশিয়ে পারমিতা বলল, এই নাও। এবারই শেষ, আর কোন দিন ড্রিংক করে আমার বাড়িতে এসো না।

তোমার বাড়ি...হ্যাঁ, তোমারই তো বাড়ি। এক সময় আমিও এখানে অনেক রাত কাটিয়ে গেছি। এখানে আমাকে আজ আসতে বারণ করছ?

আসতে পারো। অরুণিমা আর তোমাদের মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে আসতে পারো। একলা এসো না।

' আমার ভুল হয়েছিল, মিতা, আমার ভুল হয়েছিল। দারুণ ভুল হয়েছিল। আমি এখনও তোমাকে চাই। মিতা, আমি যদি অরুণিমাকে ছেড়ে দিই, তুমি আবার আমাকে ফিরিয়ে নেবে?

ছী সুব্রত, তোমার এ কথা বলতে লজ্জা করল না? তুমি আমার সঙ্গে যা করেছ, করেছ। আবার অরুণিমার সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করতে চাও? তাছাড়া আমি একটা পাগল মেয়ে–

যেন পারমিতা তাকে চাবুক মেরেছে, এই ভাবে মুখটা কুঁচকে ফেলল সুব্রত।

পারমিতার বাবা হেমরঞ্জন গত চার বছর ধরে একটা নার্সিং হোমে আছেন। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থা। সারবার কোন আশা নেই। তিনি চা বাগান এবং অন্যান্য ব্যবসা নিয়ে বেশ জমিয়ে ছিলেন, হঠাৎ সব ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। বছর দশেক আগেও তাঁর একবার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

হেমরঞ্জন যখন নার্সিং হোমে যান, তখন তার সমস্ত সম্পত্তির অধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন,জামাইকে নয় মেয়েকে। সুব্রত তাতে দারুণ চটে গিয়েছিল। সে প্রকাশ্যেই জানিয়েছিল যে হেমরঞ্জনদের বংশে পাগলামির ধারা আছে, সুতারাং পারমিতারও যে কোন দিন যে কোনসময় পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। বিষয় সম্পত্তি তদারকির ভার সুব্রতর ওপরেই থাকা উচিত। সেই সময় বেশি উৎসাহী হয়ে ঝোঁকের মাথায় সুব্রত পারমিতাকেও পাগল প্রমাণ করবার অনেক চেষ্টা করেছিল।

পারমিতার কিছু কিছু ব্যবহার দেখলে অবশ্য তাকে পাগল মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

কফির কাপটা শব্দ করে নামিয়ে রেখে দ্রুত চলে গেল সুব্রত। সিঁড়িতে শোনা গেল তার দুপদাপ পায়ের শব্দ।

।। চার ।।

ট্যাক্সিতে রেড রোড দিয়ে ফেরার পথে হঠাৎ এক জায়গায় ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল পারমিতা।

এখানে কেউ নামে না, বিশেষত কোন একলা মহিলা। তবু পারমিতা ভাড়া মিটিয়ে দিল ট্যাক্সিওয়ালাটি একটুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে দেখল পারমিতার রাস্তা পার হওয়া। দু'দিক থেকে গাড়ি আসছে প্রচন্ড জোরে। তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেল পারমিতা। কোন রকম ভ্রূক্ষেপ নেই। কোন গাড়ি যে তাকে চাপা দিল না, সেটা নিয়তি ছাড়া আর কী হতে পারে?

পারমিতা একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গাছটাতে একসঙ্গে অনেক কুঁড়ি ভেঙে অজস্র লাল ফুল ফুটেছে। যেন গাছটা লাল রঙের হাসিতে ঝলমল।

পারমিতা বলল, আজ ১৫ই এপ্রিল, মনে আছে? আজ তোমার জন্মদিন। আমায় চিনতে পারছ?

বাতাসে দুলছে গাছটির ডাল, যেন সেও কথা বলতে চাইছে পারমিতার সঙ্গে।

গত বছর ঠিক এই দিনে তোমার প্রথম ফুল ফুটেছিল। আমি তারিখ লিখে রেখেছিলুম। আজও এপ্রিলের পনেরো, আজ প্রথম তোমার ফুল ফুটল।

হাত ব্যাগ থেকে একটা রঙীন ছবির কার্ড বার করল পারমিতা। তাতে লাল ফিতে লাগানো। কৃষ্ণচূড়া গাছটার একটা ডাল নিচু করে তাতে ঐ ফিতে দিয়ে কার্ডটা সে বেঁধে দিল।

সেই কার্ডে লেখা জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

আমি এই পথ দিয়ে যাবার সময় রোজ তোমায় দেখে যাব, কেমন? এই রাস্তায় আরও অনেক গাছ আছে। কিন্তু অনেকের সঙ্গে তো একসঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না। তুমি আমার বন্ধু! মনে থাকবে?

কিছুক্ষণ গাছটার সঙ্গে এমনি সব কথা বলে তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল পারমিতা।

রেড রোডের এই পাশটা দিয়ে বিশেষ কেউ হাঁটে না। কিন্তু পারমিতার মতন একজন সুঠাম চেহারার রমনীকে একা হাঁটতে দেখলে তার পিছনে পিঁপড়ে জুটে যাবেই। কোথা থেকে এসে উদয় হল দুটি লোক, তারা পারমিতার পিছনে পিছনে আসতে আসতে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করতে লাগল।

পারমিতা গ্রাহ্যই করল না সে সব। সে একেবারে আপন মনে আছে। আকাশে থোকা থোকা মেঘে লেগেছে শেষ সূর্যের ছটা। দুরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে মনে হচ্ছে আকাশেরই কোন বাড়ি।

একজন কোন বৃটিশ রাজপুরুষের মূর্তি ছিল এক সময়। এখন মূর্তিটা নেই, কিন্তু খালি বেদীটা আছে। সেখানে গিয়ে বসল পারমিতা।

এসব জায়গাতেও কোন মেয়ে একলা বসে না। কিংবা যদি কেউ বসে,তার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে। একটু পরে পুরো অন্ধকার নামলে এখানে এসে পড়বে মাংসলোভীরা।

দূরে দাঁড়িয়ে সেই রকম কয়েকজন লোক পারমিতাকে লক্ষ্য করছে।

পারমিতা তো চোখ বুজে আছে। শূন্য পাথরের বেদীর ওপরে সে যেন একটি জীবন্ত স্থাপত্য। খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, তার ঠোঁট নড়ছে একটু একটু।

দশ মিনিট পরে একটা গাড়ি তার সামনেই রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এর মধ্যেই আবছা অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক, অন্য চলন্ত গাড়িগুলি হেডলাইট জ্বেলে যাচ্ছে।

এই খারাপ হওয়া অ্যামবাসেডর গাড়িটিতে ড্রাইভারই একমাত্র যাত্রী। সে গাড়ি থেকে নেমে এসে বিরক্ত মুখে হুড তুলল।

তখন বেদী থেকে নেমে পারমিতা আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল লোকটির পাশে।

লোকটি থমকে মুখ তুলে বলল. এ কি! আপনি—?

পারমিতা বলল, কেমন আছ, মনীশ?

মনীশ ক্রমশ বেশি অবাক হচ্ছে। সন্ধ্যে হয়ে আসা নির্জন রেড রোডে একজন সুন্দরী মহিলা হঠাৎ এসে দাঁড়াল তার পাশে।

আপনি—মানে—আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি, বলুন তো?

পারমিতা হাসিতে সারা মুখ ভরিয়ে দিয়ে বলল, আমায় তুমি চিনতে পারছ না মনীশ?

আপনাকে বেশ চেনা চেনা লাগছে, নিশ্চয়ই কোথাও দেখেছি,কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না।

এখন না মনে পড়লেও পরে মনে পড়বে।

আপনি এখানে কী করছেন?

তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলুম।

মনীশ এবার হেসে বলল, সেটা আমার সৌভাগ্য। কিন্তু হঠাৎ গাড়ির স্টার্ট বন্ধ না হলে আমার তো এখানে থামবার কথা ছিল না। আপনাকে আমি আগে দেখতেও পাইনি।

তবু আমি জানতুম, তুমি এই পথ দিয়ে আসবে, ঠিক এইখানে থামবে।

আপনি আমাকে 'তুমি তুমি' করে বলছেন যখন, নিশ্চয়ই আমাকে খুব ভালই চেনেন। আমি কিন্তু এখনো মনে করতে পারছি না—

তাতে কিছু যায় আসে না। তুমিও আমাকে 'তুমি' করে বলতে পারো।

ব্যাপারটা কোন রহস্যময় নাটকের মতন মনে হচ্ছে মনীশের। কিছুদিন ধরেই তার জীবনে এই রকম কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। বোম্বেইতে থাকার সময়, আর বোম্বাই থেকে ফিরেও। অনেকটা যেন অলৌকিক। এসব পছন্দ করে না মনীশ।

এই ভদ্রমহিলাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে বলেই সে কোন কড়া কথা বলতে পারছে না। হয়তো কোন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে দেখা হয়েছে।

মনীশ গাড়ির যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। গত সপ্তাহেই গাড়িটার টিউনিং করা হয়েছে। এরকম পথের মধ্যে হঠাৎ থেমে যাবার কথা নয়। কারবুরেটারে ওভার ফ্লো করেছে? কোন প্লাগ খুলে গেছে?

পারমিতা বলল, ছেলেবেলায় আমি খুব গাড়ি চালাতুম। এখন অবশ্য বেশ কয়েক বছর অভ্যেস নেই। তবু আমি একটু চেষ্টা করে দেখব?

মনীশ কোন উত্তর দিবার আগেই পারমিতা নিচু হয়ে তেলের প্লাগটা খুলে নিজের মুখে পুরে দিল। হুস্ করে টানতেই বেশ খানিকটা পেট্রোলে ভরে গেল তার মুখ। প্লাগটা আবার যথাস্থানে লাগিয়ে পারমিতা কুলকুচো করে পেট্রল ফেলতে লাগল তারপর রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে সে বলল,এবার স্টার্ট দাও তো। দ্যাখ, বোধ হয় চলবে।

মনীশ একেবারে স্তম্ভিত! কোন সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত মহিলা মুখ দিয়ে এ রকম পেট্রল টানবেন, এ যেন কল্পনাও করা যায় না। কারখানার মিস্তিরিরা ছাড়া অনেক মাইনে করা ড্রাইভারও এ রকম পারে না। মনীশ নিজেই তো পারে না। পারমিতার মুখে ঘৃণার কোন চিহ্নই নেই। আরও দু-একবার সে চিক্‌চিক্ করে থুথু ফেলল। তারপর বলল, স্টার্ট দিলে না?

মনীশ গাড়িতে গিয়ে বসে সুইচ ঘোরাতেই ইনজিন জীবন্ত হয়ে উঠল।

আসুন, উঠে আসুন আপনাকে কোথাও পৌছে দিতে হবে?

আমাকে ল্যান্সডাউন-সাদার্ণ এভিনিউর মোড়ে নামিয়ে দিলেই চলবে। পারমিতা অন্য দরজা দিয়ে উঠে এসে বসল মনীশের পাশে। গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে মনীশ একটা সিগারেট ধরাল। তার হঠাৎ মনে হল, ভদ্রমহিলার মুখের মধ্যে এখনো পেট্রোল আছে, কাছাকাছি আগুন নিয়ে গেল হয়তো হুস্ করে আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

এক যুবতী নারীর মুখ দিয়ে হুস্ করে আগুন বেরুচ্ছে, এই ছবিটা ভাবলেই কেমন যেন গা শিউরে ওঠে।

আমি হার স্বীকার করছি। আপনি ঠিক কে বলুন তো?

আমার নাম পারমিতা।

পারমিতা কী?

আর কিছুই না, শুধুই পারমিতা।

আপনাকে আমি কোথায় দেখেছি? আমাদের কোন কমন ফ্রেন্ড.....

সেটা তোমাকেই মনে করতে হবে, আমি বলব না। ঠিক মনে পড়বে এক সময়।

আপনি হেঁয়ালি করছেন, আমি কিন্তু হেঁয়ালি ভালবাসি না। রেড রোডে আমার গাড়ি খারাপ হল, আর তক্ষুণি আপনি এসে উপস্থিত হলেন, এর মানে কী?

ধরে নাও, কাকতালীয়। পৃথিবীর সব ঘটনার কি মানে থাকে? আমি তো অনেক কিছুর মানে বুঝতে পারি না।

সিগারেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মনীশ। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে এসে সে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল। তারপর বাঁ হাত বাড়িয়ে পারমিতার কাঁধ চেপে ধরে কঠোর স্বরে বলল, আপনি কে, সত্যি করে বলুন? কী আপনার মতলব? নইলে এক্ষণি আমি আপনাকে থানায় নিয়ে যাব।

জোর করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা না করে পারমিতা অত্যন্ত কাতর, দুঃখিত গলায় বলল, আমায় ওরকম ভাবে ধরো না, মনীশ। ছেড়ে দাও। কেউ আমায় অবিশ্বাস করলে আমার খুব কষ্ট হয়। আমার মুখের দিকে তাকাও, ভাল করে দেখ, আমায় কি খারাপ মনে হয়? আমি কি তোমার কোন ক্ষতি করতে চাই?

পারমিতার গলার আওয়াজে এমন কিছু ছিল, যাতে মনীশ তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত বোধ করে

হাত সরিয়ে আনল। তারপর একটু বিব্রত ভাবে বলল, না, না, আমি তা বলতে চাই নি, আপনি তো আমার উপকারই করলেন, কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি আমায় সব খুলে বলছেন না কেন?

আমি খুলে বললেও তুমি বুঝতে পারবে না। একদিন তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে।

তাবে তাই হোক। এবার মনীশ তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে দারুণ জোরে গাড়ি চালিয়ে চলে এলো সাদার্ণ এভিনিউতে। ল্যান্সডাউনের মোড়ে গাড়ির গতি কমিয়ে বলল, এবার বলুন, কোন্ দিকে? আপনি আপনার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসছি।

তুমি আর একদিন আমার বাড়িতে যেও। আজ আমি এখানেই নামব।

অর্থাৎ আপনি আপনার বাড়ি আমায় দেখাতে চান না। ঠিক আছে। থ্যাঙ্কস্ ফর এভরিথিং।

পারমিতা দরজা খুলে নেমে গেল,তার মুখে তখনও দুঃখের ছায়া। মনীশের সঙ্গে আর কোন কথা না বলে সে হাঁটতে শুরু করল মন্থর ভাবে।

মনীশ একবার ভাবল, চুপি চুপি গিয়ে সে এই রহস্যময়ী নারীটির বাড়িটি দেখে আসবে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই মত বদলাল। একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে গাড়ি ঘোরাল ডানদিকে।

পারমিতাদের বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট লন। এক সময় সেখানে নানা রকম গাছ ছিল। একতলাটা ভাড়া দেবার পর বাইরের লোক-জনদের হুটোপুটিতে সে সব নষ্ট হয়ে গেছে।

বাইরের গেট ঠেলে ভেতরে এসে পারমিতা চিঠির বাক্সটা একবার দেখল। এটা নিচকই অভ্যেস,কারণ তাকে কে-ই বা চিঠি লিখবে! নানান ধরণের বিল আর অফিসের চিঠিপত্র আসে শুধু।

ওপরে সিঁড়িতে লোহার গেটের কাছে বসে আছে পারুল।

দিদিমনি, তোমার আজ ফিরতে এত দেরী হল?

তুই কখন এসেছিস?

অনেকক্ষণ। আমি তো ভেবেছি, তুমি সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ফিরবে।

ঠিক যেন পারুল আগের মতন এ বাড়িতেই কাজ করে, সেই রকম কথাবার্তা। অথচ পারুল আর মাস দেড়েকের মধ্যে এদিকে আসেনি। পারমিতাও এর মধ্যে আর অন্য কোন কাজের লোক রাখেনি। নেপালী দারোয়ানরা দুটি মেয়েকে নিয়ে এসেছিল, তাদের পছন্দ করে নি পারমিতা। নিজের কাজ সে নিজেই দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছে।

তালা খুলে ভেতরে এসে পারমিতা বলল, যা, জল বসা। আমি আগে চা খাব।

পারুল বলল ইস্, মেঝেতে কি ধুলো। কতদিন মোছা হয়নি। ফ্রিজটার গায়ে ও রকম হলুদের দাগ লাগল কী করে?

পারমিতা হেসে বলল, থাক, তোকে আর গিন্নিপনা করতে হবে না। আগে চা খাওয়া আমাকে।

রাত্তিরে রান্নার কিছু ব্যবস্থা আছে? নাকি, রাত্রিরে না খেয়েই থাক?

স্যান্ডউইচ বানানো আছে, তাতেই আমার চলে যাবে। তোর জন্য ভাত-ডাল ফুটিয়ে নিস।

স্নান সেরে বারান্দার চেয়ারে বসবার পর পারুল চায়ের কাপ এনে রাখল তার সামনে। সঙ্গে চিঁড়ে ভাজা। বাড়িতে যে চিঁড়ে ছিল, তা জনতই না পারমিতা। পারুলই খোঁজ রাখত সব কিছুর।

দিদিমনি, তোমার রাগ মরেছে? নাকি এখনো রেগে আছ আমার ওপর?

পারমিতা এক দৃষ্টে চেয়ে রইল পারুলের দিকে। তার মাথার মধ্যে একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দ হচ্ছে।

দিদিমনি, আমি মিথ্যে কথা বলা একদম ছেড়ে দিয়েছি। সেই যে তুমি বলেছিলে......

এক মাস পরে...

পারমিতা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না পারুলের কথা। তার মাথার মধ্যে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দটা বেড়েই চলেছে।

আমি খবর নিয়েছিলুম, তুমি অন্য কোন লোক রাখ নি....তুমি একা একা থাক, কী খাও না খাও কোন ঠিক নেই.....

পারমিতা দু'হাতে নিজের কান চেপে ধরে বলল,চুপ কর! একটু চুপ কর!

ঝন্‌ঝন্‌ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পারমিতার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

এবার সে চায়ের কাপে চুমুক দিল নিঃশব্দ। তারপর কাপটা নামিয়ে রেখে মুখ তুলে বলল, তোর ছেলেটাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, তাই না? সে জেলে আছে!

দারুন চমকে উঠে পারুল বলল, তুমি..তুমি কী করে জানলে দিদিমনি?

সে জেলে আছে, ভালই হয়েছে। নইলে পাড়ার গুন্ডারা তাকে মেরে ফেলত।

দিদিমনি...দিদিমনি.....আমার ঐ একমাত্র ছেলে....কোন দিন খারাপ ছিল না, আর ক'টা দিন পরেই কারখানায় কাজে ঢুকত...শুধু পাড়ার ক'টা বদ্‌ লোকের পাল্লায় পড়ে...

শুধু বদ্‌ লোকদের দোষ দিচ্ছিস কেন, পারুল? তোর ছেলের জন্যই তো তুই আমার বাড়ি থেকে টুকিটাকি জিনিসপত্তর চুরি করতিস। তোর মেয়েদের কিছু না দিয়ে ঐ ছেলেকে দিতিস সব!

মেয়ে তিনটে তো ঢেঁকি...এক পয়সা রোজগার করতে পারে না, ওদের বাপ ওদের কোন বাড়িতে কাজে লাগাতে দেবে না, শুধু বসে বসে খায়....

যখন যা দরকার, এবার থেকে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিবি।

দিদিমনি, আমার ছেলেকে যে পুলিশে ধরেছে, কে তোমায় খবর দিল? নিচের বাহাদুররাও তো জানে না।

আমি যে তোর ছেলেকে দেখতে পেলুম জেলের মধ্যে সে শুয়ে আছে...ভাল আছে তোর ছেলে, কেউ মারধোর করে না।

জেলের মধ্যে...আমার ছেলেকে তুমি দেখতে পেলে? কবে? তুমি জেলখানায় গিয়েছিলে?

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে পারমিতা চলে গেল ছাদে। কিছুক্ষণ সে তার টবের গাছগুলির সঙ্গে কথা বলল। এখন তার মুখখানি বিষন্ন।

একটু পর সে তার পূজোর ঘরে ঢুকে একটা সাদা দেওয়ালের সামনে দাঁড়াল। তারপর হু-হু করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—আমি যে দেখতে পাই! আমি দেখতে পাই! কেউ বিশ্বাস করে না।

।। পাঁচ ।।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা রেড রোডে সেই একই জায়গায় মনীশ ইচ্ছে করে গাড়িটা থামাল। তারপর নেমে একটু ঘুরে দেখে এলো চারপাশটা। না, কেউ নেই।

মহিলাটি নাম বলেছিলেন, পারমিতা। পদবী বলেন নি। দেখে মনে হয় প্রায় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস, কিন্তু যত দূর মনে পড়ে সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না। আজকাল অনেকেই অবশ্য সিঁদুর দেয় না, দিলেও এত সূক্ষ্ম যে চোখে পড়ে না চট করে। হাতে আংটি ছিল কি? তাও দেখা হয় নি ভাল করে।

পারমিতা! এ নাম কি মনীশ আগে কোথাও শুনেছে? বন্ধু-বান্ধবদের জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে।

ভুরু কুঁচকে গাড়ি চালাতে লাগল মনীশ। কাল দুপুরের ফ্লাইটে তার কাঠমাণ্ডু যাবার কথা। আজ সন্ধ্যেটা সে অফিসের কাজকর্ম থেকে ছুটি নিয়েছে।

কাজ না করলেও চিন্তা ছাড়ে না। একটুক্ষণ একলা থাকলেই যত রাজ্যের অফিসের চিন্তা মনীশের মাথা জুড়ে থাকে। এত বড় একটা কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেল্‌স্ ম্যানেজার মনীশ। সেল্‌স ম্যানেজার দু'মাস ধরে অসুস্থ, এই সুযোগে মনীশ যদি সে রকম কাজ দেখাতে পারে, তাহলে কোম্পানী যে তাকেই ঐ পোস্ট দেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু কোম্পানীর কাজ নিয়ে চিন্তা করারও তো একটা সীমা আছে। আজ সন্ধ্যেবেলা একটু ক্লান্ত লাগছে তার।

একলা সিনেমা দেখার বদলে সে চলে গেল প্রতাপাদিত্য রোডে অসিতদের বাড়িতে। এটা একটা হৈ-চৈ এর বাড়ি। এরকম যৌথ পরিবার ইদানীং আর বেশি দেখা যায় না। অসিতদের বাবা-কাকারা পাঁচ ভাই একই বাড়িতে থাকেন। তাদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা চোদ্দ। তাদের বন্ধু-বান্ধব এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ভিড় লেগেই আছে।

সেকেলে দো-মহলা বাড়ি, সামনের দিকটা ছেলেমেয়েদের জন্য। এ বাড়িতে গানের আসর, ব্যাডমিন্টনের চ্যাম্পিয়নশীপ খেলা ইত্যাদি প্রায়ই হয়। প্রতি সপ্তাহেই একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। সেই জন্য যে কোন সন্ধ্যেবেলা অসিতদের বাড়িতে এসে পড়া যায়।

মনীশ এসে দেখল, এ বাড়িতে আজ একটা থিয়েটারের রিহার্সাল হচ্ছে।

আগেও থিয়েটারে করেছে অসিতরা, মনীশকে কোন একটা ভূমিকা নেবার জন্য অনেক অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু মনীশ রাজি হতে পারে নি। অফিসের কাজে তাকে এমন ব্যস্ত থাকতে হয় যে রির্হাসালে নিয়মিত আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও ছাত্র বয়েসে মনীশের ঝোঁক ছিল নাটকের দিকে।

মনীশ বসে গেল একপাশে। হুল্লোড় হাসি ঠাট্টায় সে জমে গেল বেশ। এক সময় প্রস্তাব উঠল, চাঁদা করে চা সিঙাড়া আনা হবে। মনীশ বলল,চাঁদা দরকার নেই, আজ আমি খাওয়াচ্ছি।

সে বের করে দিল কুড়ি টাকার একটা নোট।

অসিতের ছোট কাকার মেয়ে জয়তী বলল, যারা রিহার্সালে কোন কাজ না করে এমনি এমনি বসে থাকবে, তাদের রোজ এই রকম ফাইন দিতে হবে।

মনীশ বলল, ঠিক আছে। আমি রোজ ফাইন দিতে আসব।

অসিতের আর এক কাকার মেয়ে লীনা বলল, আহা-হা, যদি রোজই আসতে পারো, তাহলে আমাদের থিয়েটারে পার্ট করবে না কেন?

থিয়েটার উপলক্ষে এ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে বাইরের ছেলেদের ব্যবহারে কোন আড়ষ্টতা নেই। মনীশ অবশ্য ছাত্র বয়েস থেকেই এ বাড়িতে আসে।

জয়তী আর লীনা, এদের দুজনের সঙ্গেই মনীশের বেশ ভাব। কিন্তু মনে মনে সে জয়তীকেই বেশি পছন্দ করে রেখেছে। যদিও এ পর্যন্ত সে কখনো আড়ালে কোন সুযোগ খুঁজে জয়তীকে প্রেম–ভালবাসার কথা জানায় নি।

মনীশ চাঁচাছোলা বাস্তববাদী, রোমান্টিক ভাব সে কখনো মনের মধ্যে প্রশ্রয় দেয় নি। তার আগে নিজস্ব ফ্ল্যাট হোক, কোম্পানির গাড়ির বদলে নিজের গাড়ি কিনুক, তারপর সে জয়তীকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। তার আগে প্রেমের প্যানপ্যানানির কোন মানে হয় না। কোন মেয়েকে নিয়ে একলা একলা গঙ্গার ধারে ঘোরা কিংবা সিনেমা দেখারও সময় নেই তার। কিংবা চিঠি লিখা? তা সে জন্মে পারবে না।

জয়তী তার সামনে এসে হঠাৎ বসে পড়ে বলল, এই মনীশদা, তুমি অনেকক্ষণ ধরে অন্যমনস্ক ভাবে একদিকে তাকিয়ে কী ভাবছ?

কই, অন্যমনস্ক না তো! কে বললে?

নিশ্চয়ই। ছোড়দা তোমায় কখন থেকে ডাকছে, তুমি শুনতেই পাচ্ছ না!

অসিত অন্য দিকে হাতে বই নিয়ে প্রম্পটিং-এ ব্যস্ত ছিল, তাই মনীশ সেদিকে যায় নি। এবার অসিত বলল, এই রমেন বোম্বেতে অ্যাকসিডেন্ট করেছে। তুই শুনেছিস?

হ্যাঁ। আমি সে সময় বোম্বেতে ছিলাম, দেখতে গিয়েছিলাম ওকে।

তুই দেখতে গিয়েছিলি? ও নাকি মানুষ চিনতে পারছে না! তোকে চিনতে পেরেছিল?

মনীশ এবার উঠে গেল অসিতের পাশে। এ সব কথা চেঁচিয়ে বলা যায় না।

আমাকেও চিনতে পারে নি। আমাকে ভেবেছিল ওর বাবা। আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, বাবা, আমি তোমাকে ভুল বুঝিয়েছিলাম, আসলে আমি পরীক্ষাটা দিই নি!

অসিত একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,কী আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? রমেনের বাবা মারা গেছেন অন্তত পনেরো বছর আগে। তাঁর কথা হঠাৎ রমেনের কী করে মনে পড়ল?

মনীশ বলল, আমার দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে কথাগুলো বলল, ঠিক যেন ও ওর বাবাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

মানুষের মনের জগৎটা এমন জটিল।

অ্যাকসিডেন্টে ওর মাথায় খুব চোট লেগেছে।

তুই বোম্বে থেকে চলে এলি? ওর এ রকম অ্যাকসিডেন্ট দেখেও!

কী করব, আমার যে অফিসের জরুরি কাজ ছিল।

অসিত কী রকম যেন চোখে তাকিয়ে রইল মনীশের দিকে।

ছাত্র বয়েসে বন্ধুর জন্য বন্ধু প্রাণ দিতে পারে। সে সময় রমেনের মতন কোন বন্ধুকে হাসপাতালে বিকারের ঘোরে থাকতে দেখেও কি মনীশ বোম্বে ছেড়ে চলে আসতে পারত? কিন্তু চাকরির জীবন যে অন্যরকম। বোম্বেতে সুতপাদি আছে, আরও দেখাশুনার লোক আছে। মনীশ শুধু নিয়ম রক্ষার মতন তার বন্ধুকে একবার দেখে এসেছে হাসপাতালে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মনীশের হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে পড়ল। সেই ভদ্রমহিলাকে সে এ বাড়িতে দেখে নি তো? এ বাড়িতে এত লোকজন আসে, কোন একদিন কারুকে দেখলেও ঠিক মনে আসে না।

একটু ঘুরিয়ে মনীশ বলল, পারমিতার সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল এর মধ্যে। হঠাৎ রেড রোডে–

অসিত বলল,পারমিতা? কোন্ পারমিতা?

সেই যে তোদের এখানেই দেখেছিলুম একদিন, বেশ লম্বা মতন, বছর পঁয়তিরিশেক বয়েস......

কী জানি কার কথা বলছিস তুই! পারমিতা নাগ?

তা জানি না!

ধুৎ! এই, আবার রিহার্সাল শুরু কর।

মনীশ পরদিন এয়ারপোর্টে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, বাথরুমে মুখ ধুতে এসে আয়নায় নিজের মুখটা দেখতেই কেউ যেন তার কানে ফিস ফিস করে বলল– মনীশ! মনীশ! তুমি আজ কাঠমাণ্ডু যেও না!

মনীশের সারা শরীরে শিহরণ হল। সেই গলার আওয়াজ। বোম্বাইতে মনীশ দু'বার এই অলৌকিক স্বর শুনেছিল।

বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মনীশ জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

কোন উত্তর নেই।

কেন আমি কাঠমাণ্ডু যাব না?

এরও কেউ উত্তর দিল না। মনীশের মুখখানা কঠোর হয়ে গেল। এসব কী ভুতুড়ে ব্যাপার শুরু হল তার জীবনে?

একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মনীশ কাঁধ ঝাঁকাল। এ সব বাজে ব্যাপার নিয়ে মনীশ দত্ত মাথা ঘামায় না। অফিসের জরুরী কাজ, তাকে যেতেই হবে।

হাত-মুখ ধুয়ে মনীশ টাইয়ের গিটটা আর একবার ঠিক করে নিচ্ছে, সেই সময় আবার শুনতে পেল– মনীশ, মনীশ, আজ তুমি কাঠমাণ্ডু যেও না! যেও না!

মনীশের মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। আওয়াজটা সে চিনতে পেরেছে।

এই তো সেই রেড রোডের ধারের মহিলাটি। পারমিতা।

বোম্বাইতেও এই একই গলার আওয়াজ শুনেছিল সে। এ রকম কী করে হয়?

–মনীশ, মনীশ, আমার বিশেষ অনুরোধে, তুমি আজ কাঠমাণ্ডুতে যেও না।

কেন?

–মনীশ, মনীশ, আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি আজ কাঠমাণ্ডুতে যেও না।

কেন যাব না, গেলে কী হবে?

–মনীশ, মনীশ, আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি আজ কাঠমাণ্ডুতে যেও না।

শুনুন, আপনি আমার একটা কথার উত্তর দিন।

বাথরুমে দরজায় দুম দুম ধাক্কা। অমনি যেন সব কিছু বদলে গেল। কানের কাছের সেই কণ্ঠস্বরটা থেমে গেল একেবারে।

দরজা খুলে মনীশ দেখল তার মা।

কী রে, তুই যে বললি, এক্ষুণি বেরুবি? এতক্ষণ বাথরুমে কী করছিস?

মায়ের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল মনীশ। তখনো তার ঘোর কাটে নি।

খোকা, তোর কী হয়েছে?

কিছু না। আসছি, আমি এক্ষুনি আসছি।

ঘামে মনীশের পিঠের জামা ভিজে গেছে। কপালেও চন্দনের ফোঁটার মত ঘাম। মনীশ সত্যিকারের ভয় পেয়েছে। তার জীবনে দুর্বোধ্য কোন কিছুর স্থান নেই। কিন্তু এই ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। অন্য কারুর কাছে এরকম শুনলে সে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিত।

নিজের ঘরে এসে খাটের ওপর বসে মোজা পরতে গিয়ে সে থেমে গেল। মনে পড়ে গেল, বোম্বাইয়ের হোটেল ঘরে সেই মাঝরাতের দৃশ্য। সিগারেটের আগুনে কার্পেটটা পুড়ছে, ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘর, সেই সময় যদি সে জেগে না উঠত...। মাথায় মদের নেশা ছিল, এই অবস্থায় ঘুম সহজে ভাঙে না। একজন কেউ তাকে জাগিয়ে দিয়েছিল।

এই কণ্ঠস্বর! এই পারমিতা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

মনীশের মা আবার ঘরে ঢুকে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। মনীশ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে খাটে, ওপরের দিকে চোখ।

খাটের কাছে ছুটে এসে তিনি বললেন, কী হল, খোকন?

আমি আজ যাব না মা।

যাবি না?

না।

কাঠমাণ্ডু যাবি না কেন?

আমারপেট ব্যথা করছে। তুমি একটু অফিসে ফোন করে দেবে?

পেটব্যথা করছে? কী রকম পেটব্যথা? তোর ডাক্তার কাকাকে খবর দিতে হবে তো। কী হয়েছে, দেখি, দেখি, কোন্ জায়গাটায়–

পরে বলছি মা। আগে তুমি অফিসে ফোন করে জানিয়ে দাও। এখনো যদি টিকিটটা ক্যান্সেল করা যায়।

এত বলি, বেশি ঝাল-মশলা দেওয়া জিনিস খাবিনা, আর দিনের পর দিন হোটেলে খাওয়া......

মা, প্লীজ আগে খবরটা দাও।

ঠিক যে ভয়ের জন্যই মনীশ গেল না, তা নয়। তার মনে হল, এর আগে যেন দু'বার সে কানের কাছে ঐ ফিসফিস কণ্ঠস্বর শুনেছে, দু'বারই তার উপকার হয়েছে। মহিলাটি দূর থেকে সাবধান করে দিচ্ছেন। যে কোন উপায়েই হোক।

পেটে ব্যথার ভান করার জন্য মনীশকে একগাদা ওষুধ খেয়ে শুয়ে থাকতে হলো।

একটা ছোট রেডিও কানের কাছে নিয়ে অনবরত সে ঘোরাতে লাগল কাটা। কত রকম গান, কত রকম কথা। কত দিনের পর এক দুপুরে মনীশ অলস ভাবে বিছানায় শুয়ে রেডিও শুনছে। কোন রবিবারেও সে এমন ছুটি পায় না।

মনীশের দৃঢ় ধারণা, কাঠমান্ডুর প্লেনটার কোনরকম অ্যাকসিডেন্ট হবে। পুরো প্লেনটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অন্য যাত্রীদের বাঁচবার জন্য কিছু কি চেষ্টা করা উচিত ছিল মনীশের? কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে কেন? কেউ যদি এয়ারপোর্টে ফোন করে জানাত... নাঃ সবাই ভাবত পাগল।

প্লেন ক্র্যাশ হলে সঙ্গে সঙ্গে কি রেডিওতে খবর দেয়? রেডিও তো শোনাই হয় না আজকাল, একমাত্র ভোটের সময় ছাড়া কে -ই বা রেডিওর খবরে গুরুত্ব দেয়? ঘন্টায় ঘন্টায় রেডিওতে খবর বলা হয় না?

নেপালী ভাষায় কী যেন বলছে। না কি এটা চীনে ভাষা?

সন্ধ্যের খবরে কিছু জানা গেল না, পরের দিন খবরের কাগজেও না। তার পরের দিনও না।

সাংঘাতিক পেট ব্যথার অজুহাতে মনীশকে অফিস থেকে সাত-দিনের ছুটি নিতে হল। অফিসের ডাক্তার সহকর্মীরা এলো, এমন কি তাকে এক্সরেও করাতে হল। তিনদিন দাড়ি না কামিয়ে একটা অসুস্থ অসুস্থ ভাব হয়ে গেল তার।

আসলে সে ভেতরে অসম্ভব রাগে জ্বলছে।

এই ক'দিন কোন বিমান দুর্ঘটনা হয় নি, নেপালে কোন গন্ডগোল হয় নি, তবু যে ভুতুড়ে গলায় আওয়াজ কেন তাকে যেতে দিল না!

মনীশ কোনদিন জ্যোতিষ-ফ্যোতিসে বিশ্বাস করে না, সে কি না একটা ফিসফিসানী শুনে কাঠমান্ডু যাওয়া বাতিল করল। অফিসের ডাক্তার যদি বুঝতে পারে যে তার পেট ব্যথার ব্যাপার একদমই বানানো?

সেই জন্যই মনীশকে এর পর একবার অজ্ঞান হয়ে যাবার ভান করতে হল। বিছানা থেকে উঠতে গিয়েই পেটটা চেপে ধরে সে উফ্ উফ্ দু'বার করে ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে।

ঘরে তখন অফিসের একগাদা সহকর্মী উপস্থিত।

ঠিক সাত দিন পর মনীশ আবার অফিসে গিয়ে উপস্থিত। সকলেই বলাবলি করতে লাগল, এই ক'দিনে সে বেশ রোগা হয়ে গেছে।

বড় সাহেব মনীশকে অনুরোধ করলেন আরও কয়েকদিন ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করতে। কিন্তু মনীশ রাজি হল না। তার ভাব দেখে মনে হল, সে অফিসের জন্য জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত। এই ক'দিনে যথেষ্ট কাজের ক্ষতি হয়ে গেছে।

সন্ধ্যেবেলা মনীশ আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে এলো রেড রোড দিয়ে। সেই মূর্তিহীন শুন্য বেদীটার কাছে থামল। দুটো ভ্যাগাবন্ড সেখানে শুয়ে আছে। পারমিতার কোন চিহ্ন নেই।

মনীশের শরীরের প্রতিটি রোমকূপে রাগ। ঐ মহিলাকে খুঁজে বার করতেই হবে। দেখতে হবে ঐ মহিলা একটি ডাইনী কি না। সে মনীশের এ রকম ক্ষতি করল।

সার্দাণ এভিনিউ আর ল্যান্সডাউনের মোড়ে নেমে গিয়েছিল পারমিতা। ইস্ কেন যে মনীশ সেদিন ওর বাড়িটা দেখে রাখে নি! কী যেন সেদিন বলেছিল? এর পরে আমায় একদিন আসতেই হবে, আজ নয়! এই ধরনেরই কিছু। পরে মানে কবে? মনীশ আজই ওকে খুঁজে বার করতে চায়। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা না জানলে কী করে ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে?

ভদ্রমহিলাটি বাদিকে গিয়েছিল। এই দিকে পর পর কতকগুলো বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ি। এর মধ্যে থেকে কারুকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। মনীশ ওর পুরো নামটাও জানে না।

গাড়িটা লেকের মধ্যে পার্ক করে এসে মনীশ সাদার্ণ এভিনিউ ধরে হাঁটতে লাগল। যদি দেখা হয়ে যায়।

ল্যান্সডাউন থেকে গোলপার্ক পর্যন্ত পাঁচবার হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ল মনীশ। তবু তার এখন বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, আকাশে জ্যোস্না। মনীশ এসে লেকের একটা বেঞ্চিতে বসল। সেই ছাত্র-জীবনে বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে এসেছে কয়েকবার তারপর সে আর কখনো সন্ধ্যেবেলা লেকে আসে নি। সন্ধ্যের পর একা একা এখানকার বেঞ্চিতে বসে থাকা, ঠিক ব্যর্থ প্রেমিকের মতন।

মনীশের ঠিক সেই রকমই অবস্থা! গালে হাত দিয়ে ভেবেই চলেছে। পারমিতা নামে ঐ মাহিলাকে সে আগে কোথায় দেখেছিল? কিছুতেই মনে পড়ছে না কেন?

–কেমন আছ, মনীশ?

মনীশ একেবারে আমূল কেঁপে উঠল, কই, সে কোথায়? ঠিক যেন কেউ কথা বলল একেবারে পাশে! কিন্তু কেউ নেই।

তখন মনীশ সমস্ত অনুভূতি সজাগ করে রইল। নিশ্চয়ই আরও কোন কথা শুনতে পাবে। আরও কিছু বলবে পারমিতা। এইটুকুই শুধু ওর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র।

আর কোন কথা শোনা গেল না। হয়তো পুরোটাই মনীশের কল্পনা। প্রায় এক ঘন্টা ধরে মনীশ এখানে বসে বসে শুধু পারমিতার কথাই ভাবছে।

ন'টা বেজে গেছে, এতক্ষণ সে শুধু সময় নষ্ট করল।

গাড়িতে উঠেই মনীশের মনে হল, একটা খুব জরুরী কাজ বাকি আছে। তার স্বভাব অনুযায়ী খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে মনীশ চলে এলো নিউ আলিপুরে। একটা ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলায় উঠে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল দিল।

মনীশের বুক কাঁপছে।

দরজা খুলে দিলেন এক প্রৌঢ়া মহিলা। একটু অবাক হলেন মনীশকে দেখে।

কী ব্যাপার?

অসময়ে এসে বোধহয় বিরক্ত করলুম, দাদা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

না। জেগেই আছেন। এখন খাবেন!

আমি দু-চারটে কথা বলেই চলে যাব। পাঁচ মিনিট....

হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো।

এক বছর আগে এই ফ্ল্যাটে মনীশ প্রায় প্রতি সন্ধ্যেবেলা আসত। নিরুপম সোম ছিল তার কাছে ফাদার ফিগার। তাঁর কাছ থেকে মনীশ সব রকম কাজ শিখেছে। নিরুপম সোমের চেষ্টায় মনীশ পটাপট প্রমোশন পেয়ে অ্যাসিষ্ট্যান্ট সেল্‌স ম্যানেজার পর্যন্ত উঠে এসেছে।

এর পর মনীশের আর একটা প্রমোশন বাকি। সেল্‌স ম্যানেজার, আর সেটা পেতে

হলে নিরুপম সোমকেই সরে যেতে হয়। মনীশ সেই প্রতিযোগিতাতেই নেমেছিল গত এক বছর ধরে। এর মধ্যে নিরুপম সোম অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার অনেক সুবিধে হয়েছে। অনেকে মনীশকে বলেছিল অকৃতজ্ঞ।

কিন্তু মনীশ নিজের বিবেককে এই বুঝিয়েছিল যে, চাকরি-বাকরি বা ব্যবসা জগতে একটা র‍্যাট রেস চলছে। ইঁদুর দৌড়, সামনে এগিয়ে যেতেই হবে, একটু পিছিয়ে পড়লেই দৌড় থেকে একদম বাদ।

প্রকৃতির রাজত্বেও তো চলছে সারভাইভ্যাল অফ দা ফিটেস্ট। নিরুপম সোম নিজেও কি একদিন একজনকে সরিয়ে সেল্‌স ম্যানেজার হন নি? এবার তাঁর জায়গায় মনীশ দত্ত যাবার চেষ্টা করবে। তাতে দোষ কি আছে?

বসবার ঘরটা একদম ফাঁকা। মনীশের মনে পড়ল, এক বছর আগে এখানে প্রায় প্রত্যেক দিন পার্টি জমত। কত লোকজনের যাতায়াত। সবাই জানত, নিরুপমদার কাছে গেলে সবসময় বিনা পয়সায় স্কচ হুইস্কি পাওয়া যায়। এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট।

ছ'মাস ধরে নিরুপম সোম অসুস্থ, প্রথম প্রথম কয়েকজন সমবেদনা জানাতে এসেছিল বটে, এখন আর কেউ আসে না।

বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন নিরুপম সোম। তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় যৌবনে তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। এখনো রোগের মালিন্য নেই তাঁর মুখে।

একটা বই পড়ছিলেন মুখ তুলে বললেন, কী খবর, মনীশ?

আপনি এখন কেমন আছেন, স্যার?

বেশ ভালই তো আছি, মনে হয়।

অনেক দিন আসা হয়নি আপনার কাছে।

বস, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস।

বৌদির কাছে শুনলুম, আপনার এখন খাওয়ার সময়। আমি বেশি সময় নষ্ট করব না, আপনাকে শুধু দু-একটা কাজের কথা বলব।

অফিসের ব্যাপারে?

ইয়ে-হ্যাঁ

অফিসের ব্যাপারে আমি আর কিছু শুনতে চাই না। আমি ভাবছি, সামনের সপ্তাহে রেজিগনেশণ পাটিয়ে দেবো।

স্যার-

শোন মনীশ, আমার যা রোগ, তাতে আর পুরোপুরি সুস্থ হবার আশা নেই। তুমি এখন প্রাকটিক্যালি সেল্‌স ম্যানেজারের সব কাজই করছ, অথচ আমার জন্য তোমার প্রমোশনটা আটকে আছে। আমার এখন রিটায়ার করাই ভাল।

মনীশ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল।

তোমারও মাঝখানে কী যেন শরীর খারাপ করেছিল শুনেছিলাম-

মনীশ মুখ তুলল। তার চোখে জল।

কী হয়েছিল তোমার মনীশ?

স্যার, আমার কিছু হয় নি। আমি অসুখের ভান করেছিলাম মাত্র, আমার শরীর খুবই সুস্থ আছে।

কেন, এরকম করেছিলে কেন?

সেই কথাটাই আপনাকে আজ বলতে এসেছি, স্যার। সাত দিন পর আজ জয়েন করে দেখলুম, আমার অ্যাবসেন্সে আমার সব কাজ প্রকাশকে দিয়ে করানো হচ্ছে। প্রকাশকে আপনার মনে আছে তো, স্যার? সে আমার চেয়ে কত জুনিয়ার-

হ্যাঁ, মনে আছে।

আমার বদলে প্রকাশ গেছে কাঠমাণ্ডুতে। আজ জেনারেল ম্যানেজার বললেন, আমি ইচ্ছে করলে একমাস ছুটি নিতে পারি। অথচ , এই গত সপ্তাহ পর্যন্তও আমার এক দিনও ছুটি নেবার উপায় ছিল না, আমাকে ছাড়া কোম্পানীর চলবেই না– এ রকম একটা ভাব। অথচ, এখন আমাকে না হলেও চলে! প্রকাশ সব কাজ চালিয়ে নিতে পারবে, কোম্পানি তাই মনে করে।

অফিস তো কারুর জন্য বসে থাকে না।

স্যার, আপনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন, এটা আগে শেখান নি কেন! আমি আপনার পোস্টটা দখল করবার জন্য চেষ্টা করছিলাম, অথচ জানতাম না, আমার পোস্ট দখল করবার জন্যও এর মধ্যেই আর একজন তৈরি হচ্ছে। আমি কোম্পানির জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে দিন রাত কাজ করছিলাম, তারপর মাত্র সাত দিনের অসুখ, কোম্পানি ভাবল, আমার বুঝি কোন কঠিন অসুখ হয়েছে, অমনি আমি অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলাম!

তোমার সত্যিকারে কী অসুখ হয়েছিল বল তো!

আমার কোনই অসুখ হয় নি, বিশ্বাস করুন, আমি একেবারে ভান করেছিলাম কিংবা, আর একটা অসুখ আমার এতদিন ছিল, সেটার নাম,ভুল ধারণা। আমি তা থেকে সেরে উঠেছি।

মনীশ নিরুপম সোমের পায়ের ওপর হাত রাখল।

উনি দ্রুত পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, আরে, আরে, তুমি এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছ কেন, মনীশ?

স্যার, আমি আজ বুঝতে পেরেছি, যে সকল লোক কখনও সেন্টিমেন্টাল হয় না, তারা এই পৃথিবীর বড্ড ক্ষতি করে। ইঁদুর দৌড় মানুষকে মানায় না। স্যার, আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি!

না, না, মনীশ, তুমি ঝোঁকের মাথায় কিছু করো না। বুঝতে পারছি, তোমার মনে লেগেছে। কিন্তু তুমি খুবই এফিসিয়েন্ট।

হ্যাঁ, স্যার, আমি খুবই এফিসিয়েন্ট। আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু দারুণ দুর্ঘটনায় পড়ে হাসপাতালে যখন মুমূর্ষ, তখন, সেই খবর পেয়েও আমি পাঁচতারা হোটেলে, কোম্পানির স্বার্থে, শাঁসালো পার্টিকে মদ খাওয়াতে পারি। এর নাম এফিসিয়েন্সি!

নিরুপম অত্যন্ত অবাক হয়ে মনীশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। মনীশের মুখ থেকে এই সব কথা বেরুচ্ছে? হঠাৎ কী করে এতখানি বদল হল ওর চরিত্রের?

একটু লজ্জা পেয়ে মনীশ মুখ নামাল।

মনীশ, এসব কথা ভাবলে তো কোন জায়গাতেই চাকরি করা যায় না।

যে-সব চাকরিতে মানুষ্যত্ব নেই, সেই ইঁদুর দৌড়ের চাকরি বোধ হয় আর আমার দ্বারা কখনো করা সম্ভব হবে না।

।। ছয় ।।

সন্ধ্যেবেলা স্নান সেরেবেরিয়ে এসে পারমিতা বলল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। আমায় কি খাওয়াবি বল তো, পারুল?

পারুল বলল, মুড়ি আছে, আর পাপঁর ভেজে দেব?কিংবা দুধ-মুড়ি-কলা খাওয়াব।

পারুল, তুই একটা জিনিস আমায় খাওয়াতে পারিস। ধর, চাঁদের আলো, নদীর ধারের বাতাস আর চাঁপাফুলের গন্ধ–এই দিয়ে সরবৎ বানানো যায় না?

অ্যাঁ! কী বললে?

কিংবা ধর ডাবের মধ্যে যে নরম শাঁসটা থাকে তার সঙ্গে ন্যাসপাতির রস আর লিচুর টুকরো মিশিয়ে, তার সঙ্গে একটু গোলাপ জল আর গোলমরিচ।

কী সব আবোল-তাবোল বলছ, দিদিমনি?

আবোল-তাবোল বলছি, তাই না? এই রে! কী হবে? পাগলের মতন শোনাচ্ছে আমার কথাগুলো?

না না, তা নয়–

পারুল, আমি যদি আবার পাগল হয়ে যাই?

ও মা, অমন অলক্ষুণে কথা এই ভরসন্ধ্যেবেলা বলতে নেই গো!

একবার যে পাগল হয়েছিলুম রে, সত্যি। তোর জামাইবাবু তো সেই জন্যই আমায় তাড়িয়ে দিল। আমি সাদা দেওয়ালের সামনে বসে বিড় বিড় করে কথা বলতুম। আমার সব মনে আছে।

দিদিমনি, ও সব কথা এখন থাক। তুমি সত্যি করে কী খাবে বল তো?

না না, শোন না! আমার শাশুড়ী বেড়াতে গিয়েছিলেন গৌহাটি। আমার ননদের সঙ্গে। একদিন আমি কলকাতায়, টালিগঞ্জে আমাদের ফ্ল্যাটে শুয়ে, মাঝরাত্তিরে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে তোর জামাই-বাবুকে বললুম, শোন, তোমার মা মারা গেছেন! তা শুনে ওঁর রাগ! আমায় বললেন, মাঝরাত্রে আবার পাগলামি শুরু করলে?

কিন্তু আমি সত্যি দেখতে পেয়েছিলুম, জানিস, গৌহাটিতে কামাখ্যা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে আমার শাশুড়ী হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন, অনেক নিচে। তাই পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙেছেন, মাথাতেও চোট লেগেছে। সেইতেই উনি ভুগে ভুগে মারা গেলেন দু'মাস পরে। সবাই ভাবল, আমি অপয়া। আমি আগে থেকে বলেছিলুম। কিন্তু আমি যে সত্যিই আগে থেকে দেখতে পেয়েছিলুম, সেটা কি আমার দোষ?

দিদিমনি, তুমি একটু ঠান্ডা হয়ে বস তো। তোমাকে আমি একটু গরম দুধ দিই, খেয়ে নাও আগে।

যখনই আমার বেশি খিদে পায়, তখনই বুঝতে পারি আমার মাথায় আবার একটা কিছু হবে। এর মধ্যেই মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে।

তুমি একটু শুয়ে থাকো বরং।

দুপুরে অফিসে অনেক কিছু খেয়েছি। এক্ষুণি আমার খিদে পাবার কথা নয়, অথচ পেট জ্বলে যাচ্ছে। এটা মিথ্যে খিদে , বুঝলি? অথচ গত এক মাস আমি বেশ ছিলুম, তাই না। গত এক মাসে মনীশের কথা আমার আর একবারও মনে পড়েনি।

কার কথা?

সে আছে একজন। তুই চিনবি না। আমি এখন কিছু খাব না, পারুল, আমি এখন ছাদে যাচ্ছি।

এখন যেও না, এখন একটু শুয়ে থাকো। গরম দুধ খাও সব ঠিক হয়ে যাবে।

না রে, আমার যখন মাথা ঝিম ঝিম করে তখন পুজোর ঘরে না গেলে চলে না। তোকে পূজোর ঘরে ঢুকতে বারণ করি কেন জানিস? ও ঘরে অন্য কেউ ঢুকলেই একটা গন্ধ হয়, তাতে আমার ধ্যানের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তখন আমার কষ্ট বেড়ে যায় খুব।

ওখানে তুমি কার পুজো কর, দিদিমনি? ওখানেতো কোন ঠাকুর নেই!

এ পুজোতে ঠাকুর লাগে না।

পারমিতা ছাদের ধারে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বসল গিয়ে সাদা দেওয়ালের সামনে। কতক্ষণ বসতে হবে ঠিক নেই। মাথার মধ্যে ঝন ঝন শব্দটা একটু করে বাড়ছে। তাতে আনন্দ হচ্ছে পারমিতার। আজ নিশ্চয়ই সে মনীশকে দেখতে পাবে।

প্রায় এক মাস সে মনীশকে হারিয়ে ফেলেছে।

মাঝে মাঝে তার মাথাটা সাধারণ মানুষের মতন হয়ে যায়। তখন সে 'সুস্থ'। কিন্তু এই সুস্থতা সে পছন্দ করে না। আর পাঁচজন মানুষের মতন শুধু খাওয়া-দাওয়া, অফিস-চাকরি

আর ঘুমোনো তার পছন্দ নয়।

এক এক সময় সে অন্যরকম হয়ে যায়। সে অনেক কিছু দেখতে পায়, যা অন্য কেউ দেখে না। সেই সময়টায় পারমিতা একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। সেই সময়ই সে আসলে খুব সুখী।

প্রায় দেড় ঘন্টা পরে তার মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলক হল। সে দেখতে লাগল ছবির পর ছবি।

একটু বাদে তরতর করে নেমে এসে পারমিতা বলল, আমি একটু বেরুচ্ছি রে, পারুল। ফিরতে দেরী হলে তুই খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়িস। আমি গেটের চাবি নিয়ে যাচ্ছি।

পারুল ছুটে এসে বলল, রাত হয়ে গেছে, এখন তুমি একা একা কোথায় যাবে, দিদিমনি?

তোর ভয় নেই, আমার কিছু হবে না।

আমি তোমার সঙ্গে যাব?

না।

গেটে তালা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল পারমিতা। সে কোথায় যাবে, তা জানে। তাকে খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। রাজা বসন্ত রায় রোড থেকে বেরিয়ে এসে সে সোজা সার্দাণ এভিনিউ পেরিয়ে লেকে এসে ঢুকল।

জলের ধারে একটা বড় গাছের নিচে একটা বেঞ্চে একলা বসে আছে মনীশ। দু'হাতে মুখ গোঁজা। আজ আকাশে চাঁদ নেই।

কেমন আছ, মনীশ?

পারমিতা তিনবার এই প্রশ্ন করার পর মনীশ আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকাল। একটুও অবাক হল না।

পারমিতা তুমি এসেছ? এত দেরি করলে কেন?

খুব দেরি করেছি, তাই না?

অনেক দেরী করেছ, তবু ঠিক সময়েই এসেছো।

তোমার পাশে একটু বসব?

বস। এবার বল, কেন এত দেরি করলে?

এই এক মাস আমি অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলাম, মনীশ। এই এক মাসের মধ্যে আমি তোমায় একবারও দেখতে পাই নি।

সেই জন্যই তুমি এই এক মাস আমার কানে কানে কোন কথা বলনি?

দেখতে না পেলে কথা বলব কী করে?

বোম্বেতে....তুমি আমায় দেখতে পেয়েছিলে?

হ্যাঁ। একদম চোখের সামনে। আমি দেখলুম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, ঘরের আলো জ্বলছে, আর সিগারেটের আগুনে পুড়ছে তোমার কার্পেট.....

তুমি কি করে এরকম দেখতে পাও?

তা জানি না। তুমি ই এস পি'র কথা শুনেছ? এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশান? বোধ হয় তাতে এ রকম হয়। কী জানি। আমাকে অনেকে পাগল বলে। প্রথম প্রথম ভাবতুম, এ সবই বুঝি আমার পাগলামি। হয়তো সত্যিই আমার পাগলামি। কিন্তু আমি তো কোনদিন কারুর ক্ষতি করি নি!

জানি। পারমিতা, তুমি আমায় বাচিয়ে দিয়েছ। এই এক মাসে আমি অনেক বদলে গেছি। আমি বুঝতে পারি, আমি এখন অন্য মানুষ।

তোমাকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল, তুমি মনে মনে খুব অসুখী। তখনই আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে কি আমি কোন সাহায্য করতে পারি না? অথচ, কি সাহায্যই করব? আমার কি আছে!

তুমি আমায় যা সাহায্য করেছ, সে রকম সাহায্য কোন মানুষকে কোন মানুষ যে করতে

পারে, তা আমি জানতুম না। এই একটা মাস আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে অনেক কিছু বুঝে গেছি। তুমি আমায় প্রথম কোথায় দেখিছিলে, বলব? আমার এখন মনে পড়েছে। টালিগঞ্জে ট্রাম ডিপোর কাছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য। তুমি আর সুব্রতদা একটা ট্যাক্সি ডেকিছিলে.....ট্যাক্সিটা থামল,.. আমি পিছন থেকে দৌড়ে এসে সেই ট্যাক্সিটায় উঠে পড়লুম। অফিসের একটা দারুণ জরুরি কাজ ছিল...তাই চোখ কান বুজে অভদ্রতা করেছিলুম......সুব্রতদা আমায় একটু একটু চিনতেন, খুব অবাক হয়ে বললেন, এ কি, মনীশ না? আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিলুম, সর্দারজী, চলিয়ে, জলদি! তুমি কোন কথা বল নি। ট্যাক্সিটা ছেড়ে যাবার পর আমি তোমার মুখখানা দেখতে পাই। আমি বিবেকশুন্য, তাই র্নিলজ্জের মতন তাকিয়ে দেখেছিলুম তোমাকে। তুমি সেদিন খুব রাগ করেছিলে, না?

একটুও রাগ করিনি। আমার মনে হয়েছিল, এই মানুষটা নিশ্চয়ই খুব দুঃখী। এমনই দুঃখী যে একা একা বসে কখনো যে নিজের দুঃখটাকে চিনবে, তারও সময় পায় না।

সত্যি, এই কথা ভেবেছিলে?

হ্যাঁ। কিন্তু সেদিন থেকেই যে তোমার সঙ্গে আমার নিয়তি গাঁথা হয়ে গেল, তা বুঝতে পারি নি। তারপর থেকে প্রায়ই আমি মনে মনে তোমার ছবি দেখতে পেতুম।

তুমি আমায় কাঠমাণ্ডু যেতে বারণ করেছিলে–

পারমিতা হাসল।

হাসছ কেন?

সেবার তুমি খুব রেগে গিয়েছিলে আমার ওপর। আমাকে খুঁজতে এসেছিলে। তখন আমায় দেখতে পেলে বোধহয় খুনই করে ফেলতে। তাই না?

আমি বোকা ছিলুম তো, তাই বুঝতে পারি নি। প্রথম সাতদিন কিছুতেই বুঝতে পারি নি, তুমি আমায় কেন কাঠমাণ্ডু যেতে বারণ করেছিলে। তুমি যদি আমার উপকার চাও....। তারপর এখানে এসে কিছুক্ষণ বসবার পরই আমার কাছে সব কিছু জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গেল। কাঠমাণ্ডুতে গেলে আমি নিজেকে চিনতে পারতুম না। কাঠমাণ্ডুতে যাই নি বলেই অফিসে আমার ভূমিকাটা পরিস্কার হয়ে গেল। তখনই বুঝলাম, যে-অফিসের জন্য আমি প্রাণ দিচ্ছিলাম, যে-কোন দিন সেই অফিস আমায় আবর্জনার মতন দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। তাহলে কি আমাদের প্রাণের দাম এত তুচ্ছ?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মনীশ আবার বলল,আমি জানি, তুমিই আমায় নিরুপম সোমের কাছে পাঠিয়েছিলে।

পারমিতা মুখ ফিরিয়ে কালো জল দেখতে লাগল।

মনীশ বলল, এই এক মাস তোমার কোন চিহ্ন পাই নি, তোমার ঠিকানা জানি না। পুরো নাম জানি না, তবু আমি এখানে এসে রোজ বসে থাকতাম আর মনে মনে জোর দিয়ে বলতাম, পারমিতার সঙ্গে আমার দেখা হবেই, হবেই, হবেই! পারমিতা, তুমি আমাকে আর ছেড়ে যেও না।

আমি যদি আরও বেশি পাগলামি করি,ভয় পাবে না তো?

এখন তো আমি নিজেও পাগল হয়ে গেছি! এখন আমার ভয় কী? পারমিতা, তুমি একদিন আমায় তোমার বাড়ি নিয়ে যাবে বলেছিলে, মনে আছে?

চল।

দু'জনে উঠে দাঁড়াল। তারপর আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগল। অন্য মানুষদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা দুজন মানুষ।

শকুন্তলা

।। এক ।।

আপনি এখানে কি করে এলেন?

দরজা খোলা ছিল। সদর থেকে এখানে আসবার জন্যে তিন তিনটে দরজা। সব ক'টাই খোলা।

সব দরজা খোলা?

হ্যাঁ। কেউ বাধা দিল না। আমি একটু অবাক হয়েছিলুম। আপনার চোর-টোরের ভয়ও নেই? অবশ্য এরকম আপনাকেই মানায়।

আপনি কে?

চোর নই। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

এ সময় আমি কারুর সঙ্গে দেখা করি না। আমার এখন কথা বলার সময় নেই।

কথা না-ই বা বললেন। আমি এখানে চুপ করে বসে থাকব। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আপনাকে দেখব।

হাতে এক তাল কাদামাটি রগড়াতে রগড়াতে শকুন্তলা নিজেই ভাল করে লোকটিকে দেখল। শম্ভুটা মহা ত্যাঁদোড় হয়েছে, সব ক'টা দরজা খোলা রেখে নিশ্চয়ই রাস্তায় কোন ঝিয়ের সঙ্গে ফস্টি-নস্টি করতে গেছে। অবশ্য সকাল দশটায় হুট করে কোন চোরের ঢুকে পড়ার কথাও না। এ পাড়ায় চোরেরা জানে যে এ বাড়িতে বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না।

লোকটি বেশ লম্বা, এককালে সুপুরুষই ছিল মনে হয়। এখন শরীরে বেশ চর্বি লেগেছে। বড় বড় চুল, চোখের নিচে কালো দাগ, সম্ভবত অসংযমের ছাপ। সিগারেটটা ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছে খুব আলতো ভাবে। আর সিগারেট–ধরা আঙুল দুটি যে একটু একটু কাঁপছে, তা শকুন্তলা আগেই লক্ষ্য করেছে। সাদা পাঞ্জাবী ও ধুতি সদ্য পাট-ভাঙা, সেই তুলনায় পায়ের চটি জোড়া বেশ ময়লা ও রবারের। যতদূর আন্দাজ করা যায়, একটি ভদ্র গোচের লম্পট।

শকুন্তলা একটুও বিচলিত হল না, ভয় পেল না। অনধিকারী পুরুষদের কিভাবে শাসন করতে হয় সে জানে। তার বয়েস উনচল্লিশ, সে অর্ধেক পৃথিবীর জল খেয়ে এসেছে।

পাতলা মতন হাসি ছড়িয়ে শকুন্তলা জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কী বলুন তো? আমায় দেখতে এসেছেন মানে? আমি কি বিয়ের যুগ্যি কনে, না বাজারের বেশ্যা?

এমন সহজ ও অনাড়ম্বর আক্রমণে লোকটি প্রথমে একটু চমকে যায়। তারপর সামলে নিয়ে সে-ও হাসে। তারপর বলে, তা নয়। আপনি বিখ্যাত শিল্পী শকুন্তলা সেনগুপ্ত, আমি আপনাকেই দেখতে এসেছি। আমার নাম প্রবীর মজুমদার। নমস্কার।

এই নামে শকুন্তলার চোখের চমক পড়ল না, কোন চেনা সুর বাজল না। তার দুহাতেই কাদামাখা, সুতরাং হাত জোড় করে নমস্কার করারও কোন প্রশ্ন ওঠে না।

শকুন্তলার পরনে একটা চটের আলখাল্লা, সেটা তার কাঁধ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝোলা। তার তলায় শুধু শায়া আর ব্রা। জল কাদা নিয়ে মূর্তি গড়ার সময় শাড়ি পরলে খুবই অসুবিধে।

কি দরকার চটপট বলে ফেলুন। আমার সময় নেই।

প্রবীর মজুমদার বলল, আমার সময় আছে। আমি অপেক্ষা করব।

বেশি নছল্লা আমি পছন্দ করি না। আমার সঙ্গে আপনার কোন কাজের কথা আছে?

হ্যাঁ আছে। কিন্তু সেটা আমি এখুনি বলব না, পরে বলব।

একটা ন্যাকড়া তুলে শকুন্তলা আঙুলের কাদা মুছে ফেলল ভাল করে। তারপর সে-ও

পাশের টুলের ওপর থেকে তুলে নিল সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। শকুন্তলা সিগারেট খাওয়া কমাতে চায়, কিন্তু অন্যের সিগারেটের ধোঁয়া নাকে লাগলে তার মন উচাটন হয়। অনেকক্ষণ পর পর সে শম্ভুকে ডাকে, তার হাতে কাদা থাকলে শম্ভুই এসে একটা সিগারেট তার ঠোঁটে গুঁজে দেশলাই জ্বেলে দেয়।

শকুন্তলা দেশলাই জ্বালবার আগেই প্রবীর মজুমদার এগিয়ে এসে ফট্ করে একটা লাইটার টিপল তার সামনে।

সিগারেট ধরিয়ে প্রথম ধোঁয়া ছাড়বার পর শকুন্তলা বলল ধন্যবাদ। তারপর বলল, আমাদের বাড়ির প্রায় উল্টোদিকে একটা চায়ের দোকান আছে দেখেছেন?

প্রবীর মজুমদার বলল, না, লক্ষ্য করিনি।

দেখলে আরও লক্ষ্য করবেন যে ওখানে পায় আট-ন-দশটা ছেলে বসে আছে। ওরা প্রায় সারাদিন ওখানে বসে থাকে, কারণ ওরা বেকার। ওরা আমায় দিদি বলে খুব মানে। ওদের ডেকে যদি আপনাকে এখান থেকে বার করে দিতে বলি, তাহলে সেটা আপনার পক্ষে মোটেই সুখকর হবে না।

আপনি আমাকে বার করে দিতে বলবেন কেন?

আমার এই সিগারেটটা শেষ হওয়ার মধ্যে যদি আপনি আপনার কথাবার্তা না শেষ করতে পারেন, তাহলে আপনাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে বলব।

কেন? আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করিনি। এমনি এমনি কি কেউ কারুকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়?

আপনি আমার যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন। সেটা বোঝার মতন বুদ্ধি আপনার নেই। আমার সময় নষ্ট করা মানে ক্ষতি করা নয়? কোন ভদ্রলোক কখনো আগে থেকে না জানিয়ে হুট করে শিল্পীর স্টুডিওতে ঢুকে পড়ে না।

আপনি সিগারেটটা অত তাড়াতাড়ি টানছেন কেন? আমাকে তাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি।

শম্ভু!

এবার বুঝি পাড়ার ছেলেদের ডাকবেন? কিন্তু ওরা যদি আমার গলাধাক্কা দিতে না চায়? উল্টে ওরা যদি আমায় দেখে কিংবা আমার নাম শুনে আমার অটোগ্রাফ চায়?

এবার শকুন্তলা ছুঁচোলো চোখে প্রবীর মজুমদারকে আর একবার দেখল। তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

অটোগ্রাফ? আপনার?

হ্যাঁ। অনেকে চায়।

আপনি ফিল্ম অ্যাকটর? কিংবা আধুনিক গান করেন?

ও দুটোর কোনটাই না। তবু, কেউ কেউ, দশজন বেকার ছেলের মধ্যে অন্তত দু'তিনজন আমায় চিনতে পারে, আমার কাছে সই চায়।

আপনি যে-ই হন না কেন, এখানে ধ্যাষ্টামো করতে এসেছেন কেন? যান, ভালো চান তো ফুটুন এখন!

আপনার মুখের ভাষা খুব চমৎকার। বিশেষত মেয়েদের মুখে এরকম ভাষা শুনতে আমার ভাল লাগে।

হাড়কাটায় যান না। আরও অনেক ভাল ভাষা শুনতে পাবেন। আমার কাছে ভাষা মারাতে এসেছে! শম্ভু!

এবার শম্ভু এসে উঁকি মারল। আঠারো-উনিশ বছর বয়েস, কালো ফুল প্যান্ট ও সাদা গেঞ্জি পরা, মুখখানা ঘোড়ার মতন লম্বাটে।

চায়ের কাপে সিগারেটটা নিভিয়ে শকুন্তলা কড়া গলায় বলল, সদর দরজা খুলে

রেখেছিলি কেন? তোকে হাজার বার বলেছি না, এই সময় আমি কারুর সঙ্গে দেখা করতে চাই না। এই ভদ্রলোককে নিয়ে যা, বাইরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দে । আর চা করে নিয়ে আয় আমার জন্য।

প্রবীর বলল, আপনি তা হলে খুবই ব্যস্ত। আমি তবে কবে আবার আসব?

শকুন্তলা আবার হাতে একতাল মাটি নিয়ে বলল, আমার সঙ্গে যদি আপনার সত্যি কোন কাজের কথা থাকে, সে জন্য আমি যথেষ্ট সময় দিয়েছি। আপনি যদি কোন অর্ডার দিতে চান, তাহলে আগেই জানিয়ে রাখছি, আমি এখন হেভিলি বুক্‌ড, আগামী তিন বছরের মধ্যে আমি কোন কাজ নিতে পারব না। আরও একটা কথা জানানো দরকার, আপনি যদি আপনার নিজের মূর্তি গড়াতে চান, তা হলে পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেও আমি সে-কাজ নেব না। আপনার মাথাটা খুবই আন্‌-ইন্টারেস্টিং। বোঁদা-মার্কা। আপনি ইচ্ছে করলে কুমোরটুলিতে যেতে পারেন।

প্রবীর খুব উপভোগ করে হাসল কথাগুলো শুনে।

তারপর বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার মুন্ডুটা যে-কোন স্কাল্পটরের কাছেই খুব আন্‌-ইন্টারেস্টিং মনে হবে। কিন্তু আপনাকে দিয়ে আমি কোন মূর্তি গড়াতে আসি নি। আপনার সঙ্গে আমার অনেক দরকারি কথা ছিল, সে-জন্য অনেকক্ষণ সময় লাগবে।

আমি একজন শিল্পী, আমার কাজের বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আমি কথা বলতে আগ্রহী নই। বিশেষত একজন অচেনা লোকের সঙ্গে।

আপনার যারা বন্ধু, তারাও অনেকেই নিশ্চয়ই এক সময় আপনার অচেনা ছিল।

আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল তো। শুনুন মশাই , আমার যারা বন্ধু-ফন্ধু, তাদের কোটা একেবারে ফুল। আর আমার কোন নতুন বন্ধু চাই না।

এটা আপনার ভুল ধারণা।

এনাফ ইজ এনাফ! যাস্ট গেট আউট অফ হিয়ার, উইল য়ু!

প্রবীর শকুন্তলার চোখে সরাসরি চোখ রাখল। শকুন্তলা ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতন চেয়ে আছে, একটুও চোখ সরাল না।

প্রবীর বলল, এরকম ভাবে আসা বোধ হয় আমার ভুলই হয়েছে। আমি চলে যাচ্ছি। আমার নামটা মনে রাখবেন, প্রবীর মজুমদার। এরপর আপনার বন্ধুদের কাছে যখন এই ঘটনাটা বলবেন, তখন দেখবেন, অনন্ত দু' একজন ঠিকই চিনতে পারবে আমার নামটা। আপনার বন্ধু অরিন্দম, সে হয়তো খুব রেগেই যাবে আমার নাম শুনে। অরিন্দম আমার সম্পর্কে যা যা বলবে তা সব যেন বিশ্বাস করবেন না। ওসব রাগের কথা।

শকুন্তলা তার হাতের কাদার তালটা ছুড়ে মারল প্রবীরের মুখে। অব্যর্থ টিপ, প্রবীরের একটা চোখ সমেত বাঁদিকের মুখটা ভরে গেল কাদায়।

শম্ভু হি হি করে হেসে উঠল।

রুমাল দিয়ে শুধু চোখটা পরিস্কার করল প্রবীর, বাকি কাদা মুছল না। সেও মিটি মিটি হাসছে।

শকুন্তলার রাগ তখনো কমেনি। ফুঁসতে ফুঁসতে সে জিজ্ঞেস করল, অরিন্দম আমার বন্ধু, একথা কে বলেছে আপনাকে?

প্রবীর বলল,এটা কি কোন অজ্ঞাত ঘটনা? কলকাতার অনেকেই জানে। আমাকে অবশ্য অরিন্দম নিজেই বলেছে আপনার সম্পর্কে।

কি বলেছে অরিন্দম?

আপনি ইস্ট বার্লিন গেলেন, সেই সময় অরিন্দমও গেল ওখানে। আপনারা একই হোটেলে ছিলেন।

সো হোয়াট?

এটা কিছুই ব্যাপার নয়। একটা ঘটনা মাত্র।

অরিন্দম এইসব কথা আপ্রনাকে বলেছে, অর্থাৎ অরিন্দমের সঙ্গে আপনার এতটা ঘনিষ্ঠতা আছে?

ঠিক ঘনিষ্ঠতা বলা যায় না। তবে পরিচয় অনেক দিনের।

পা দিয়ে একটা টুল ঠেলে দিল শকুন্তলা। সেটা উল্টে পড়ে গেল।

শকুন্তলা বলল, ওটা তলে নিয়ে বসুন। আমি এক্ষুণি অরিন্দমের কাছে চেক করছি। দেখতে চাই সত্যি সে আপনাকে চেনে কিনা। অর হোয়াদার ইউ আর আ স্মল টাইম ক্রুক!

টুলটা তুলে নিয়ে বেশ গ্যাট হয়ে বসল প্রবীর।

শম্ভু, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি, ওপর থেকে টেলিফোনটা নিয়ে আয়।

শম্ভু ছুটে চলে যেতেই প্রবীর বলল, আপনার মেজাজটা খুব চমৎকার। এর আগে আপনি আর কারো মুখে কাদা ছুড়ে মেরেছেন?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে শকুন্তলা বলল, বেরিয়ে বাঁ দিকের বারান্দার কোণে বাথরুম। যান, মুখটা ধুয়ে আসুন।

থাক না। মন্দ কী! আশা করি আমার মুখের বোঁদা বোঁদা ভাবটা এবার অনেকটা কেটে গেছে?

আরও বেড়েছে।

এই দুঃখে আমি এক সময় দাড়ি রেখেছিলুম। তাতে অনেকটা ম্যানেজ হয়ে যায়। গত বছর দোলের সময় দাড়ি কেটে ফেললুম।

আমি আপনার জীবন-কাহিনী শোনবার জন্যে আগ্রহী নই।

আজ থেকে ঠিক সাতদিনের মধ্যে দেখা যাবে, আমরা পরস্পরের বিষয়ে অনেক কিছু জানি।

হোয়াট কনসিট! আপনি খুব ভুল জায়গায় এসেছেন। শকুন্তলা সেনগুপ্তর কাছে সহজে কেউ পাত্তা পায় না।

শম্ভু ওপর থেকে টেলিফোনটা এনে প্লাগে লাগিয়ে দিল। তিন-বারের চেষ্টায় নম্বর পাওয়া গেলেও জানা গেল যে অরিন্দম বাড়ি নেই। শকুন্তলা তখন চেষ্টা করল অরিন্দমের অফিসে। সেখানে থেকেও সে একটু আগেই বেরিয়েছে।

শকুন্তলার মুখের বিরক্তি লক্ষ্য করে প্রবীর বলল, আপনি তাহলে শান্তনুকেও ফোন করতে পারেন। শান্তনু রায় চৌধুরী। সে বোধ হয় এখন বাড়িতে থাকবে।

আপনি শান্তনুকেও চেনেন?

শান্তনু রায় চৌধুরী বিখ্যাত লোক, তাকে চেনা তো আর্শ্চয কিছু নয়। তবে, শান্তনুও আমাকে চেনে অবশ্য।

শান্তনু কলকাতায় নেই, কাল বোম্বে গেছে। আপনি আমার বন্ধুদের মধ্যে আর কাকে কাকে চেনেন?

রণের রায়, বাদল কর্মকার, প্রীতি হালদার, নন্দগোপাল আইচ-এ রকম অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। আর্টিস্টদের মধ্যে অনেককেই আমি চিনি, এক সময় ক্যালকাটা পেইন্টার্স গ্রুপের সঙ্গে খুব আড্ডা দিয়েছি।

উম্, বেশ খবর–টবর রাখা হয় দেখছি। আমার এতসব বন্ধু যদি আপনাকে চেনে, তাহলে তারা-কি যেন নাম বললেন আপনার, প্রবীর মজুমদার-তাহলে তারা কেউ কোন দিন আমার কাছে আপনার কথা কিছু বলেনি কেন?

এদের মধ্যে কেউ না কেউ, কোন না কোন প্রসঙ্গে যে আমার নাম একাধিকবার বলেছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। আপনি এখন খেয়াল করতে পারছেন না। তাছাড়া

আপনি গোড়া থেকেই ধরে নিয়েছেন যে আমি একটা বাজে লোক।

আপনি আপনার পরিচয় দিচ্ছেন না কেন?

আমার একটা ছোট্টখাট্টো অহংকার আছে। আমার নাম শুনে যদি কেউ চিনতে না পারে, সেখানে আমি নিজের পরিচয় দিই না।

কিন্তু কারুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে.......আপনি নিজে থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তখন আপনার পরিচয় দেবেন না?

শম্ভু চা নিয়ে এলো এক কাপ।

আর এক কাপ নিয়ে আয়।

শকুন্তলা প্রবীরকে বলল, আপনি এবার মুখটা ধুয়ে আসুন, আপনাকে আমি আধঘন্টা সময় দেব। আপনি আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছেন।

।। দুই ।।

চায়ে চুমুক দিয়ে শকুন্তলা বলল, এবারে বলুন।

একটা টুলের ওপর বসে একটা পায়ের ওপর অন্য পা তুলে দিয়েছে শকুন্তলা । তার আলখাল্লার তলার দিকটা, কাটা সেই জন্য তার বাঁ পায়ের ডিম পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়ে গেছে, অন্য যে কোন মেয়ে এতে লজ্জা পায়, কিন্তু শকুন্তলার ভ্রুক্ষেপ নেই।

মুখ-টুখ ধুয়ে এসেছে প্রবীর। তার জামায় জল লেগেছে এখানে ওখানে, চুলের খানিকটা অংশও ভিজে।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে প্রবীর বলল, আপনি আমার সিগারেট খাবেন?

শকুন্তলা হাতটা বাড়িয়ে দিল।

পনেরো-ষোলো বয়েস থেকে মাটি-কাদা, প্লাস্টার, পাথর ও ব্রোঞ্জ নিয়ে কাজ করছে শকুন্তলা । ঐ হাতে সে ছেনি-বাটালি ধরেছে। তার গড়া একটা ১৬ ফিট লম্বা অর্জুনের মূর্তি আছে হায়দ্রাবাদে শালারজঙ্গ মিউজিয়ামে।

এ ছাড়া আট-দশ ফিটের মূর্তি তো অনেক। তবু শকুন্তলা র হাত মজুরদের মতন শক্ত ফাটা-ফাটা নয়, মেয়েদের হাতের মতনই। গায়ের রং তেমন উজ্জ্বল নয় শকুন্তলার, মাজা মাজা।

অল্প সময়েরই মধ্যে শকুন্তলার হাতখানি ভাল করে দেখল প্রবীর।

তারপর মনে মনে বলল, হু, যত কঠিনতা বুঝি এই মেয়েটির মনে। দেখা যাক!

সিগারেট ধরাবার পর শকুন্তলা আবার জিজ্ঞেস করল, কী, চুপ করে বসে আছেন যে?

প্রবীর বলল, আমি প্রথম থেকেই আপনাকে এই কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করছি যে আমি এখানে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার জন্যই এসেছি। আমি আপনার কাজ দেখতে চাই।

আর্টিস্ট অ্যার্ট ওর্য়াক? হা-হা-হা-হা-! কোন বইতে এরকম পড়েছেন বুঝি। আর্ভিংস্টোনের লেখা সব রগরগে বই-টই!

প্রবীর চুপ করে রইল।

শকুন্তলা আবার বলল, তার ওপর আবার মেয়েছেলে আর্টিস্ট! বাঙালী ব্যাটাছেলেদের কাছে তো ব্যাপারটা আরও মজার, তাই না? কোন বাঙালী মেয়ে স্কাল্প চার করছে, এটা এখানকার পুরুষদের ঠিক বিশ্বাস হয় না! আপনার বুঝি ধারণা, আমি যেসব মূর্তি-টূর্তি গড়েছি, সে সব আমার পুরুষ অ্যাসিস্ট্যান্টরাই আসলে সব করে আমি শুধু আইডিয়া ফাইডিয়া দিই? কি, ঠিক বলিনি?

না, আমার এ রকম ধারণা নয়। তবে, বড় বড় মূর্তি গড়ার কাজে অন্য দুএকজনের সাহায্য নেওয়াও আশ্চর্য কিছু নয়।

আপনি বলছিলেন, আমার সঙ্গে আপনার বিশেষ কোন কাজের কথা আছে।

তা তো আছেই। কিন্তু সেটা এক্ষুনি নয়। আপনার সঙ্গে পরিচয় কিছুটা সইয়ে নেবার পরেই।

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আজকের বেশী আর গড়াবে না, ইউ ক্যান বী শিওর অ্যাবাউট দ্যাট!

আপনি সত্যিই খুব ডিফিকাল্ট ধরনের মহিলা!

আমি ডিফিকাল্ট? আপনি কী? আপনি একটা, হামবাগ্! আমি কয়েক দিন ধরে অত্যন্ত ব্যস্ত, একটা সাবজেক্ট সবেমাত্র শুরু করেছি, এই সময় আপনার মতন একটা উটকো লোক এসে আমার সময় নষ্ট করবার কি অধিকার আছে? আপনি আজ সকালে আমার মুড নষ্ট করে দিলেন, এর পর আর সারাদিন হয়তো আমি কাজ করতেই পারব না।

আপনি আবার রেগে যাচ্ছেন!

আমি রাগব না! এ দেশের বেশীরভাগ মানুষই জানে না, একজন আর্টিস্টের মূড নষ্ট হয়ে গেলে–

আমি দুঃখিত।

আপনার মত এক হরিদাস পাল দুঃখিত হল বা না হল, তাতে আমার কী আসে যায়। আমার সকালটা তো নষ্ট হল!

প্রবীর ভাবল, এবারে তার চলে যাওয়াই উচিত। এভাবে শকুন্তলার সঙ্গে ভাব করা যাবে না। চক্ষুলজ্জা কিংবা ভদ্রতার একেবারে ধার ধরে না শকুন্তলা। অপরিচিত লোকদের সে সহ্য করে না। প্রবীর বলল, আবার যেন কাদার তাল ছুঁড়ে মারবেন না। এবারে আমি সত্যিই চলে যাচ্ছি।

কিন্তু প্রবীরকে তক্ষুণি যেতে হল না।

সে উঠে পড়বার আগেই শম্ভু বলে উঠল, দাসবাবু এসেছেন!

তারপরই হাতে ব্যাগ নিয়ে ঢুকল একটি ফিটফাট চেহারার যুবক। দেখলেই বোঝা যায় জুনিয়ার এক্সিকিউটিভ।

ঘরে ঢুকে সে প্রবীরকে দেখে যেন থ মেরে গেল। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল নিস্পলক।

প্রবীর এই যুবকটিকে চেনে না। কোথাও দেখেছে বলেও মনে পড়ে না।

যুবকটি বিগলিতভাবে ব্যাগ সমেত হাত তুলে প্রবীরকে নমস্কার জানিয়ে বলল, ভাল আছেন?

প্রবীর বলল, হ্যাঁ। আপনি ভাল?

আন্দাজেই সে অনেকের সঙ্গে এই রকম ভাবে কথা বলে।

শকুন্তলা তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছে ওদের দুজনকে। তার সঙ্গে দেখা করতে এসে ঐ ছেলেটি আগে প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে কথা বলছে, এটা তার পছন্দ হবার কথা নয়।

যুবক আবার বলল, আপনাকে গত মাসে দেখেছিলুম বই মেলায়......এবার যুবকটিকে থামিয়ে দিয়ে শকুন্তলা বলল, কী ব্যাপার, রবীন, আমার সঙ্গে তোমার কোন জরুরি কথা আছে?

রবীন এবার মুখ ফিরিয়ে বলল,হ্যাঁ, শকুন্তলাদি, আমাদের হেডঅফিস থেকে একটা টেলেক্স এসেছে, আপনাকে একবার বম্বে যেতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব......

শকুন্তলা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, বম্বে? আমায় যেতে হবে–কেন? আমার সময় নেই!

রবীন বলল, আমরা টিকিট-ফিকিট কেটে ব্যবস্থা করে দেব, আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

শকুন্তলা ধমক দিয়ে বলল, বলছি যে আমার সময় হবে না এখন!

রবীন ছেলেটি বেশ হাসিখুশি। শকুন্তলার ধমকে একটুও দমে না গিয়ে সে মুচকি

হেসে বলল, বাঃ, ও কথা বললে চলে, আপনাকে যেতেই হবে যে। আপনার সেই ফিনিক্স পাখির মূর্তিটা–আমাদের বোম্বে অফিসে বসাবার কথা। তার ব্রোঞ্জ কাস্টিং এ কী যেন ভুল হয়েছে–

দপ্ করে জ্বলে উঠে শকুন্তলা বলল, রায় অ্যান্ড রায় থেকে করাতে বলেছিলুম, নিশ্চয়ই সেখানে থেকে করায়নি!

রবীন বলল, তা আমি জানি না। এখন কারেকশান করার জন্যে আপনাকেই যেতে হবে। নইলে আপনারই মূর্তি ব্যাঁকাট্যারা হয়ে থাকবে।

প্রবীর খুব মন দিয়ে শুনছে ওদের কথা।

শকুন্তলা প্রবীরের দিকে এক ঝলক জ্বলন্ত চোখে তকিয়ে রবীনকে বলল, চল, ওপরে চল। এসব কথা যার তার সামনে আলোচনা করা যায় না।

প্রবীর জিজ্ঞেস করল, আমি অপেক্ষা করব, না চলে যাব?

সে আপনার ইচ্ছে। তবে দয়া করে এখানকার কোন জিনিসে হাত-টাত দেবেন না।

প্রবীর বসেই রইল। তার কোন তাড়া নেই। আজ সারাদিন সে কোন কাজ রাখেনি।

শকুন্তলা নেমে এলো মিনিট কুড়ি বাদে।

রবীন দাস একবার দরজার বাইরে থেকে কৌতূহলী চোখে প্রবীরকে দেখে নিয়ে চলে গেল।

শকুন্তলা আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, তা হলে আপনি একজন কবি? তা এ রকম লম্পটের মতন চেহারা করেছেন কেন?

প্রবীর হাসল।

শকুন্তলা আবার বলল, আমার বাংলা বই-টই বিশেষ পড়া হয়ে ওঠে না। মানে অনেক দিন পড়িনি। জীবনানন্দ দাসের অনেক কবিতা এক সময় আমার মুখস্ত ছিল। যাক গে সে-কথা। আপনি কী ধরনের কবি.....প্রগতিশীল না......কি বলে যেন.....ডিকাডেন্ট......বাংলায় কী যেন....অবক্ষয়ী! আপনি প্রগতিশীল না অবক্ষয়ী?

প্রবীর এবার পাল্টা প্রশ্ন করল, শিল্পী হিসেবে আপনি এর মধ্যে কোন্‌টা?

শকুন্তলা বলল, সব শিল্পীই প্রগতিশীল। শিল্পীরা সব সময়ই আর্টকে এবং সেই সঙ্গে সমাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে।

প্রবীর বলল, কবিদেরও বোধ হয় শিল্পীদের দলে ফেলা যায়।

আপনার একটা কবিতা পড়ে শোনান তো!

একটা কেন, আপনাকে আমার অনেক কবিতা শোনাব কোন এক সময়। তবে এখন নয়। কারণ, আমার কোন বই তো সঙ্গে নেই।

মুখস্ত থাকে না কবিতা?

প্রবীর হেসে বলল, না।

শকুন্তলা বলল, যা-ই হোক, এখন পরিচয় জানলুম যে আপনি একজন কবি। বেশ নাম-টাম আছে। লোকে আপনাকে দেখলে চিনতে পারে! এখন বলুন তো, এই অধমের কাছে কবি মশাইয়ের কী দরকার?

আমি আপনাকে পর পর দু'দিন স্বপ্ন দেখছি!

স্বপ্ন? আমাকে?

হ্যাঁ। কেন দেখলুম বলুন তো! আপনার নাম আমি জানি, আপনার আঁকা কিছু ছবি আর ভাস্কর্যও আমি দেখেছি,কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার তো কখনো আলাপ হয় নি, সুতরাং আপনাকে স্বপ্নে দেখা আর্শ্চয নয়? তাও পর পর দু'দিন।

ইউ বেটার গো টু আ সিকিয়াট্রিস্ট!

এটা কোন অসুখের লক্ষণ বলছেন?

স্বপ্নে কী দেখলেন আমাকে? ন্যাংটো হয়ে আপনার কোলে বসে আছি।

আপনি এ রকম ভাষা ব্যবহার করছেন কেন, আমাকে চমকে দেবার জন্য?

ছাড়ুন! ওসব কবি-টবিদের ন্যাকামি আমার ঢের জানা আছে। স্বপ্ন-ফপ্ন'র কথা বলে আমার মন গলিয়ে দিয়ে তারপর আমার সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা। এই তো! কোন সুবিধে হবে না।

আপনি কি আমায় বুভুক্ষু ভেবেছেন যে প্রেমে পড়ার জন্য যে -কোন ছুতো করে আপনার কাছে ছুটে আসব?

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আমি বুভুক্ষ নই।

তার মানে অন্য অনেক মেয়ে-টেয়ের সঙ্গে আপনার ভাব আছে। এখন সারা সকাল বসে বসে কি আমি আপনার জীবন-কাহিনী শুনব? দাঁড়ান মশাই, আগে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে নিই।

ঝট করে দেওয়াল আলমারির পাল্লা খুলে শকুন্তলা একটা ব্র্যান্ডির বোতল বার করল। ছিপি খুলে কাঁচাই চুমুক দিল খানিকটা। তারপর গলার জ্বালাটা খানিকটা সহ্য করার পর সে বলল, এটা কনিয়াক, অনেক কষ্ট করে জোগাড় করতে হয়, তাই আপনাকে অফার করতে পারছি না আমি আপনাদের দেশি ব্র্যান্ডি খেতে পারি না। একদম স্পিরিটের গন্ধ।

প্রবীর ভাবল, শকুন্তলার অনেক ছবি বা মুর্তিই গ্রামের গরিব-দুঃখী মানুষদের নিয়ে। অথচ ফরাসী ব্যান্ডি না হলে তার চলে না। এটা এক ধরনের মজার বৈপরীত্য, তার চেয়ে বেশি কিছু না।

আর একবার বোতলটিতে চুমুক দিয়ে শকুন্তলা সেটিকে আলমারিতে ভরে রাখল।

তারপর চোখ কুঁচকে বলল, আপনার জীবন-কাহিনী শোনবার আগে আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলে নিই। একবার দিল্লিতে একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছিলুম, বছর দু-এক আগে। উঠেছিলুম ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসে। পাশের ঘরটাতেই উঠেছিল একজন.... তার নামটা আর বলছি না, আগে থেকে একটু একটু চেনা ছিল। সেই লোকটা জানত যে শুভব্রতর সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। আন্ অ্যাটাচ্ড মেয়েমানুষ দেখলেই তো পুরুষ মানুষদের চোখ চকচক করে ওঠে। পুরুষরা ভাবে এই সব মেয়েদের শরীর যখন তখন ভোগ করা যায়। এই মক্কেলও আমায় দেখে শিকারী বেড়াল হয়ে উঠল। রাত দশটায় আমার ঘরের দরজায় ঠক ঠক। আমি দরজা খুলতেই বলল, ওর খুব একা একা লাগছে, আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে চায়। হাতে একটা হুইস্কির বোতল, আমি যদি ওর সঙ্গে ড্রিঙ্কসে একটু সঙ্গ দিই......। ফেয়ার এনাফ। আমি বললুম, আসুন। দুজন পরিচিত মানুষ কি একটু আধটু ড্রিঙ্ক করতে গল্প করতে পারে না? কিন্তু লোকটা দু-তিন চুমুক দিয়েই শুরু করল পয়িং।

কী শুরু করল?

পয়িং! উঠে এসে আমার ধার ঘেঁষে বসল। তারপর আমার পিঠে হাত রাখল। তারপর কথা বলতে বলতে চাপড় মারতে লাগল আমার উরুতে। আমি দু'বার সরে সরে বসলাম। একবার মুখে বললুম, ও রকম করবেন না। তবু না শুনে সে আমায় চটকাচটকি করতে চায়। আমার পায়ে শক্ত জুতো ছিল, সেই জুতো সুদ্ধ পা তুলে লোকটার থুতনিতে ঝাড়লুম অ্যাইসান এক লাথি যে ঘুরে পড়ে গেল। বিশ্বাস না হয়, ঠিকানা দিচ্ছি, গিয়ে দেখে আসুন এখনো তার থুতনিতে কাটা দাগ আছে।

প্রবীর শব্দ করে হেসে উঠে বলল, আপনার এই গল্পে রীতিমত একটা মর‍্যাল আছে মনে হচ্ছে!

লোকটাকে কেন ওরকমভাবে মেরেছিলুম জানেন? ও আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন মূল্যই

দেয় নি। পুরুষ মানুষরা ভাবেন তারা যখন চাইবে, তখন সব মেয়েকেই রাজি হতে হবে।

আপনি যা বলছেন, প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে সেটা সত্যি, তা আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে মেনে নিচ্ছি।

নাউ, শুট।

আমি আপনাকে আমার জীবন-কাহিনী শোনাতে আসিনি, কারণ আমার জীবন বেশ জটিল। কেউ আমাকে কখনো মারেনি, অথচ আমার অনেক রক্তপাত হয়েছে। আমি আপনাকে দু'দিন স্বপ্ন দেখেছি বলেই আপনার সম্পর্কে খুব কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। নিশ্চয়ই আমার মনের কোন একটা স্তরে আপনার সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা ছিল, নইলে এরকম স্বপ্ন দেখলুম কেন? সেই জন্যই...... আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে, আপনাকে চিনতে এসেছি?

ব্যস, চেনা হয়ে গেছে তো! এবার–

না, কিছুই চেনা হয়নি। স্বপ্নে যে রকম দেখেছিলুম–

কী মুসকিল, আপনি আমায় স্বপ্নে দেখেছেন, তার জন্য আমি কি করতে পারি? আমি কবিদের ব্যাপার জানি না, তাদের বোধহয় কবিতা লেখা ছাড়া আর কোন কাজ-কাম করতে হয় না, দখিন হাওয়া খেলেই তাদের পেট ভরে যায়। কিন্তু আমি রীতিমতন খেটে খাই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। দিনের বেলার কারুর সঙ্গে বসে আলাপচারি করার সময় আমার নেই। আপনি ইচ্ছে করলে কোন দিন সন্ধ্যের পর আসতে পারেন, সন্ধ্যের পর আমি কোন কাজ করি না।

প্রবীর কথাটা একটু চিন্তা করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বেশ তাই হবে। কিন্তু আপনার কাজের মধ্য দিয়েই আপনাকে চেনার ইচ্ছে ছিল আমার।

শকুন্তলা বলল, অদ্ভুত আবদার!

হ্যাঁ। আমার ইচ্ছেটা একটু অদ্ভুতই বটে।

আমি প্রথমেই যদি আপনাকে তাড়িয়ে দিতুম, তাহলে আপনি কি করতেন?

কাল আসতুম, পর্শু আসতুম, তার পরের দিন আসতুম.....আমার যখন জেদ চেপে গেছে–

এরকমভাবে আগে কেউ আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসে নি। বসুন!

।। তিন ।।

এর পর এক ঘন্টা কেউ কোন কথা বলে নি।

শকুন্তলা তার মূর্তি নির্মাণে একাগ্র হয়েছে। প্রথমে সে মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে। এই মূর্তিটার কাজ দু-এক দিন আগে শুরু হয়েছে, এখনো বোঝবার উপায় নেই কিসের মূর্তি।

একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে প্রবীর। সে বসে আছে একটা টুলে। পিছনে হেলান দেবার উপায় নেই। এই রকম অবস্থায় বেশিক্ষণ বসে থাকা বেশ কষ্টকর কিন্তু প্রবীর একবার ও চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নি।

এর মধ্যে শম্ভু আর একবার চা দিয়ে গেছে।

শকুন্তলার চা শম্ভু তার মুখের কাছে তুলে ধরে। শকুন্তলা অন্যমনস্ক ভাবে দু-চার চুমুক খেয়েই মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় যে আর দরকার নেই। তার চোখ সব সময় মূর্তির দিকে। এখন যেন পৃথিবীর আর কোন কথাই তার মনে নেই।

সেই রকম ভাবেই কাজ করতে করতে একসময় শকুন্তলা মূর্তির দিকে চোখ রেখেই বলল, অরিন্দমের সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয়?

প্রবীর প্রথমে বুঝতেই পারে নি প্রশ্নটা তারই উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় বার শোনার পর সে বলল, বছর সাত-আটেক হবে বোধ হয়।

আপনারা কি একসঙ্গে পড়তেন?

না।

কোথায় আলাপ হল?

প্রথম দিন কোথায় আলাপ হল তা ঠিক মনে নেই। তবে, প্রবীরের এক জেঠতুতো দাদা একটা প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন, তিনি আমারও একটা বই ছাপেন... সেই সূত্রেই প্রথম আলাপ হয়েছিল বোধ হয়।

সেটা তো ফর্মাল আলাপ। তাতেই জার্মানির কোন হোটেলে সে আমার সঙ্গে একসঙ্গে ছিল কি না সেই গল্প করে?

আপনি কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। আমি কিন্তু আপনাকে ডিস্টার্ব করিনি একবারও।

আপনি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? ঠিকঠাক উত্তর দিন। অরিন্দমের সঙ্গে আপনার কতখানি ঘনিষ্টতা?

অরিন্দম মাঝে মধ্যে আসে আমার কাছে। এসে একটা না একটা ছুতোয় ঝগড়া লাগিয়ে দেয়।

তার মানে? এ আবার কি ধরনের বন্ধুত্ব?

আপনি কুহুকে চিনতেন?

কুহু...... মানে অরিন্দমের বৌ?

হ্যাঁ, শী ফেল্ ফর মী। অরিন্দমের ধারণা, আমার জন্যই কুহুর সঙ্গে ওর বিচ্ছেদ হয়। কুহু কিন্তু আমার সঙ্গে থাকতে আসে নি কিংবা আমার কাছ থেকে কোন প্রশ্রয়ও পায় নি। কুহু এখন–

বাদল রহমানকে বিয়ে করেছে।

হ্যাঁ। সুতরাং আমার দিক থেকে খুব একটা দায়িত্ব ছিল এটা বলা যায় না। কুহু আমাকে একটা উপলক্ষ করেছিল মাত্র। অরিন্দম আর কুহুর বিবাহ বিচ্ছেদে আমার যদি কোন দায়িত্ব থাকে, তবে আপনারও সমান দায়িত্ব আছে।

আমার?

আপনি জার্মানিতে অরিন্দমের সঙ্গে এক হোটেলে ছিলেন, এ কথাটা যদি কুহু জানে, তবে তার পক্ষে কি মেনে নেওয়া সহজ?

এক হোটেলে মানে তো এক ঘরে নয়? আমরা যে-হোটেলে ছিলুম, সে-হোটেলে তিনশো ছাব্বিশটি ঘর ছিল।

কিন্তু আপনি আর অরিন্দম এক ঘরেই রাত কাটিয়েছিলেন।

কে বলল আপনাকে? আপনি.......আপনি....

আপনি উত্তেজিত বা রেগে যাচ্ছেন কেন? এটাই কি সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার নয়? আপনি আর অরিন্দম পরস্পরকে আগে থেকেই চেনেন, ইচ্ছে করে এক হোটেলে উঠেছেন......

কে বলেছে ইচ্ছে করে?

অরিন্দমের থুত্নিতে কোন লাথির দাগ নেই। সুতরাং অণুমান করা যায় আপনি তাকে ফিরিয়ে দেন নি।

তার মানে এই নয় যে রাত্তিরে আমি ওর সঙ্গে এক ঘরে ছিলুম। আমি ইচ্ছে করলে যার সঙ্গে খুশি থাকতে পারি, সেটা আলাদা কথা! কিন্তু আপনি কি করে ধরেই নিলেন যে–

আমি ধরে নিই নি। ওটাই আমার প্রথম স্বপ্ন!

স্বপ্ন? আপনি আমাকে নিয়ে এই স্বপ্ন দেখেছেন?

হ্যাঁ। এবং আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে এই স্বপ্ন দেখার পর আমি খুব ঈর্ষান্বিত বোধ করেছিলুম। যদিও আমি আগে কখনো আপনাকে চোখেও দেখি নি।

স্ট্রেঞ্জ!

অদ্ভুত তো বটেই। সহজে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই জন্যেই তো আমি আজ এসেছি।

আপনি কবে দেখেছেন এই স্বপ্ন?

প্রায় মাস দেড়েক আগে।

আমি জার্মনি গিয়েছিলুম অন্তত দু'বছর আগে। আর এতদিন পর আপনি সেই স্বপ্ন দেখলেন!

হ্যাঁ।

স্বপ্নটা কি রকম এবার জানতে পারি?

শুনবেন? আমি দু-একবার বিদেশে কয়েকটি জায়গায় গেছি বটে, কিন্তু জার্মানিতে এ পর্যন্ত যাওয়া হয় নি। কিন্তু স্বপ্নে আপনাদের হোটেলটি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। হোটেলটি বেশ বড় হলেও বাইরের দিকটা সাদা-মাটা। লাল ইটের রং। ঠিক বলছি কি?

হ্যাঁ, মিলছে বটে। কিন্তু এসব কথা আপনি অরিন্দমের কাছ থেকে শুনেছেন।

বাকিটা শুনুন। একতলার লবির দু'পাশে চারখানা লিফ্‌ট। কিন্তু বাঁদিকের প্রথম লিফ্‌টে উঠলুম, ঠিক যেন যন্ত্রচালিতের মতন বোতাম টিপলুম সাততলার। ওপরে উঠে এসে দেখলুম, লিফ্‌টের ঠিক সামনের ঘরটির নম্বর সাতশো একুশ। তার দরজার সামনেই একজন বেল বয় কার্পেট থেকে কি যেন খুঁটে খুঁটে তুলছিল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে দরজার বেল টিপলুম। তখন রাত্তির পৌনে বারোটা। দু'বার বেল বাজাবার পর দরজা খুললেন আপনি। পাতলা গোলাপি রঙের একটা নাইটির ওপর শান্তিনিকেতন বাটিকের কাজ-করা একটা ড্রেসিং গাউন আলগা ভাবে আপনার শরীরে জড়ানো। আপনার চোখে জল।....... আপনি আজ আমার সঙ্গে গোড়া থেকেই খুব রূঢ় আর পুরুষালি ধরণের ব্যবহার করলেও, সেদিন, অর্থাৎ সেই রাতে অর্থাৎ সেই স্বপ্নের মধ্যে আপনি ছিলেন খুবই নরম আর কোমল। মনে হয়, আপনি অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছিলেন, আমাকে দেখে আপনি আমার বুকে দু'হাতে কিল মেরে বললেন, তুমিএত দেরি করলে কেন? কেন.....? আমি উঁকি দিয়ে দেখলুম, মেঝের ওপর একদিকে কাত হয়ে শুয়ে আছে অরিন্দম..... দেখলে মনে হয় সে মৃত!

ইম্পসিবল্! এটা আপনার স্বপ্ন? আমার কাছে গুল-গপ্পো মারতে এসেছেন? এ সবই আপনি শুনেছেন অরিন্দমের কাছে।

আমি অরিন্দমের কাছে শুধু এইটুকুই শুনেছি যে জার্মানিতে এক সময়ে একই হোটেলে আপনারা দু'দিন ছিলেন। অরিন্দম অফিসের কাজে গিয়েছিল আমস্টারডামে, সেখান থেকে জার্মানিতে যায় শুধু আপনার সঙ্গেই কয়েকটা দিন কাটাবার জন্য। এ কথা সে খুব গর্ব করে বলেছে আমাকে। অর্থাৎ সে বোঝাতে চেয়েছে যে আপনার মত বিখ্যাত একজন মহিলা তার গার্লফ্রেন্ড, কুহু তাকে ছেড়ে চলে গেল,কি না গেল, তা সে গ্রাহ্য করে না। হোটেলে আপনার ঘরের দৃশ্যটির কথা কিন্তু অরিন্দম কিছুই বলেনি। ওটা সম্পূর্ণই আমার কল্পনা। মেলেনি?

ওটা আপনার কল্পনা। ফের আমার সঙ্গে চালাকি করছেন? অরিন্দম মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, এটা আপনি কল্পনা করেছেন।

আপনার কাছে আমি শুধু মিথ্যে কথা বলব কেন? আমাকে যারা চেনে তারা জানে যে আমি অকারণে মিথ্যে কথা বলি না।

হয়তো এটা অকারণ নয়!

স্বপ্নের বাকি অংশটা শুনবেন?

বলুন!

আমি অরিন্দমকে কার্পেট থেকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, আপনি নিষেধ করলেন। ওর জামাটামা জলে ভেজা। ওর জ্ঞান ফেরাবার জন্য আপনি ওর মাথায় এক ফ্লাস্ক কনকনে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছিলেন।

তারপর?

তার পরের অংশটা আরও অদ্ভুত। অরিন্দমকে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে আপনি আমাকে বললেন ঘরের বাইরে যেতে। আপনিও বেরিয়ে এসে দরজাটা টেনে দিলেন। আপনার খালি পা। সেই অবস্থাতেই আপনি আমায় বললেন, চল–!

শকুন্তলার দুটি চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে সে আবার দেওয়াল আলমারিটা খুলল। কনিয়াকের বোতলে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে এবার সে বোতলটি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, চলবে?

না থাক।

সিগারেট ধরিয়ে শকুন্তলা বলল, এ রকম অদ্ভুত কাহিনী আমি জীবনে কখনো শুনিনি। তারপর?

প্রবীর বলল, আপনি আমায় বললেন, চল। আমি লিফ্‌টের দরজার দিকে গেলুম, আপনি বললেন, ওদিকে নয়। সাত তলার লম্বা করিডোর ধরে আপনি হেঁটে গেলেন একেবারে শেষ প্রান্তে। সেখানে একটা দরজার গায়ে লেখা এমার্জিন্সি এক্সিট। সেই দরজাটা খুলতেই দেখা গেল, একটা লোহার সিঁড়ি। ফায়ার এস্কেপ। আপনি বললেন, এসো। আমরা দু'জনে সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলুম। যেন মধ্যরাত্রে আমরা লুকিয়ে হোটেল থেকে পালাচ্ছি, যদিও তার কোন দরকার ছিল না, হোটেলের দরজা সারা রাতই খোলা থাকে। যাই হোক, ফায়ার এস্কেপের একেবারে তলাটা তো মাটির সঙ্গে ছোঁয়া থাকে না, খানিকটা উঁচুতে, আমরা ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে পড়লুম মাটিতে। আপনি বললেন, উফ্। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমার লেগেছে, শকুন্তলা? আপনি বললেন, না। তারপরই ছুটতে শুরু করলেন। সেখানে খানিকটা বাগান মতো। বাগানটা পার হবার পরেই একটা নদী। বেশি চওড়া নয়। আকাশে ফ্যাকাশে চাঁদের আলো, তাতে নদীটা, কী রকম যেন রহস্যময়। নদীর ধারে পুরু ঘাস, প্রায় জাজিমের মতন, আমারও ইচ্ছে করছিল জুতো খুলে ফেলতে....একটু দূরে একটা ধপধপে সাদা ব্রীজ, আর্চের মতন বাঁকানো, ঠিক যেন একটা ছবি। আপনি বললেন, চল প্রবীর, আমরা নদীর ওপারে যাই...। বলতেবলতে আপনিআবার কেঁদেফেললেন, তখন আমি আপনার হাত ধরলুম, তারপর দুজনে খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম ব্রীজটার দিকে.........।

এইখানেই স্বপ্নটার শেষ। অনেক স্বপ্নই মানুষ ভুলে যায়। আমিও কত স্বপ্ন ভুলে গেছি। কিন্তু এটা ভুলিনি, হুবহু মনে আছে।

শকুন্তলা শেষের দিকে প্রায় আচ্ছন্নের মত হয়ে গিয়েছিল। শুনছিল চোখ বন্ধ করে। এবার চোখ চেয়ে গাঢ় গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জাদুকর, না মায়াবী?

প্রবীর হেসে বলল, কিছুই না। তবে আমার স্বপ্ন দেখার রোগ আছে।

এর নাম স্বপ্ন? কোন মানুষ কখনো এরকম স্বপ্ন দেখে? ইতিহাসে কেউ কোনদিন এমন কথা শোনে নি।

অনেকটা মিলে গেছে, তাই না?

অনেকটা মানে? আপনি সত্যি জার্মানিতে কখনো যান নি? হোটেল ভাইমারে কখনো থাকেন নি?

না।

অথচ হোটেলটা অবিকল ঐ রকম। সাত তলায় লিফ্‌টের ঠিক সামনেই সাতশো একুশ নম্বর ঘর। এই সব ডিটেইল্‌স তবু অরিন্দম বলতে পারে আপনাকে। বাকি যে সব কথা অরিন্দম নিজেই জানে না...... সে সত্যই সারা রাত অজ্ঞান হয়ে ছিল....আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, খুব একা একা লাগছিল, কারুকে চাইছিলুম, কথা বলার জন্য... ভীষণ পাগল পাগল লাগছিল, অরিন্দমের ওপর দারুণ রেগেই কান্না এসে গিয়েছিল ঘর

থেকে বেরিয়ে এমনিই হাঁটতে হাঁটতে দেখলুম এমার্জেন্সি এক্সিট লেখা দরাজা......সেটা খুলতেই ফায়ার এস্কপের লোহার সিঁড়ি........। এ সব কথা তো অরিন্দম জানে না! আপনি কি করে জানলেন? সত্যি করে বলুন–

কি করে জানলুম তা যে আমি নিজেই জানি না। সে জায়গাটাও আমি আগে কখনো দেখি নি, আপনাকেও আমি আগে কখনো দেখি নি।

স্বপ্নে আমার চেহারাটা কি রকম ছিল?

একটু অন্য রকম ছিল।

তার মানে আমার এই চেহারার সঙ্গে মেলে নি। আপনি আমাকে সুন্দরী বলে কল্পনা করেছিলেন। আজ এসে দেখলেন এক কাঠখোট্টা মেয়ে।

আপনি আপনার নিজস্ব ধরণের সুন্দর। সে কথা নয়। আপনাকে আগে কখনো চাক্ষুষ না করলেও আপনার ছবি দেখেছি, সুতরাং আপনার চেহারার একটা আদল কল্পনা করা শক্ত কিছু নয়। কিন্তু একই চেহারার মানুষকে প্রত্যেক দিন এক রকম দেখায় না। স্বপ্নে তাই আপনি একটু অন্য রকম ছিলেন!

তবু অনেক দূরের দেশে, এক মধ্যরাতে একা একা আমি নদীর ধারে হেঁটেছিলুম, আর কেউ আমায় দেখেনি... অথচ একজন অচেনা মানুষ সেটা স্বপ্নে দেখল... এটা কি করে সম্ভব?

এ ক্ষেত্রে তাহলে বলতে হয়, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। তবে এ রকম স্বপ্ন আমি আরও দেখেছি। সবগুলো মিলয়ে দেখতে যাই নি, কিন্তু কয়েকটা মিলেছে। খুবই আশ্চর্য ভাবে মিলে গেছে।

কবিরা বুঝি এ রকম স্বপ্ন দেখে?

অন্য কবিদের কথা জানি না। তবে আমার অদ্ভূত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার রোগ আছে ঠিকই।

আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। আর.....ইয়ে... আপনার দ্বিতীয় স্বপ্নটা কি?

সেটা এখন থাক। পরে বলব।

পরে মানে?

পরে মানে এক্ষুণি নয়। আর একটু সময় যাক। আপনি কাজ করতে করতে থামিয়ে দিয়েছেন, আবার একটু কাজ করে নিন বরং।

এই রকম মনের অবস্থায় কেউ কাজ করতে পারে? আপনি আমায় আজ এমন একটা ব্যাপার শোনালেন, ...একে অলৌকিক ছাড়া আর কি বলা যায়?

এখন বাজে সওয়া একটা। আপনি দুপুরে খান কখন? দুপুরে যদি আপনার বিশ্রাম নেওয়ার ব্যাপার থাকে, তাহলে আমি এখন চলে যেতে পারি। অন্য সময়ে আসব।

কোথায় যাবেন, বসে থাকুন চুপ করে। আপনাকে এখন আর আমি ছাড়তে পারি? আমার খাওয়া–দাওয়ার কিছু ঠিক নেই। যা হোক একটা কিছু খেয়ে নিলেই হল। আপনার খিদে পেয়েছে?

একটু একটু যদি কিছু না মনে করেন, একটা কথা বলব? চলুন না, আমরা বাইরে কোথাও গিয়ে খেয়ে নিই, খানিকক্ষণ গল্প ও করা যাবে।

বাইরে? তাহলে আবার শাড়ি–ফাড়ি পরতে হবে। সে অনেক ঝামেলা। এখানেই কিছু খাবার আনিয়ে দিচ্ছি আপনরার জন্য।

তাহলে আর একটা কাজ করব। ঐ যে ছেলেটি আপনার এখানে কাজ করে....শম্ভূ........ওকে দিয়ে কয়েক বোতল বীয়ার আর কিছু চীনে খাবার আনিয়ে নিলে হয় না? এখানে বসেই তাহলে বেশ একটা পিকনিকের মতন করা যায়। অবশ্য যদি আপনার কাজের অসুবিধে না হয়।

গুলি মারো কাজ! আজ আর কিচ্ছু হবে না। .....শম্ভূ!......শম্ভূ!

শম্ভূ এসে দাঁড়াতেই প্রবীর পকেটে হাত দিল টাকা বার করবার জন্য। শকুন্তলা হাত উঁচু করে বলল, উঁহু, ওটা চলবে না। এটা আমার বাড়ি।

প্রবীর বলল, আমি প্রস্তাব করেছি , সুতরাং দামটা আমিই দেব।

শকুন্তলার স্বভাবই হল ধমক দিয়ে কথা বলা। সেই রকম গলায় বলল, একদম নয়। টাকা বার করবে না। ছেলেরাই সব সময় দাম দেবে, ওসব মেলশ্যভিনিজম এখানে চলবে না। তোমার চেয়ে আমার রোজগার কিছু কম না।

যে-মাটির তাল নিয়ে মূর্তি গড়ছিল শকুন্তলা, তার তলায় পুরু করে খবরের কাগজ পাতা। সেই কাগজের ভাঁজ থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করল শকুন্তলা।

শম্ভুর দিকে নোটটা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোর সাইকেলটা সারিয়েছিস? যা, চট করে সাইকেল নিয়ে যা। পাঁচ বোতল খুব ঠান্ডা বীয়ার আনবি, আর দু'তিন প্যাকেট চীনে খাবার। কি কি আনতে হয় জানিস তো? যা, বেশী দেরী করবি না।

শম্ভু আড়চোখে বারবার দেখতে লাগলো প্রবীরকে। তার মুখে বেশ অবাক-অবাক ভাব।

শকুন্তলা তাড়া দিয়ে বললো, হাঁ করে দেখছিস কি, যা দৌড়ে চলে যা।

শম্ভু চলে যাবার পর বিনা দ্বিধায় শকুন্তলা তার আলখাল্লাটা খুলে ফেলে বলল, বড্ড গরম লাগছে।

এখন সে শুধু ব্রা আর সায়া পরা।

প্রবীর নিষ্পলক ভাবে চেয়ে রইল তার দিকে। তেমন আর যুবতী নেই শকুন্তলা।

কিন্তু তার শরীরে বিশেষ মেদ জমেনি। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় বেশ দীর্ঘাঙ্গিনী। গায়ের রং শ্যামলা। প্রবীরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগল শকুন্তলার পিঠ, ঠিক যেন নদীর পারের মত মসৃণ ভূমি।

শকুন্তলা জিজ্ঞেস করল, পুরুষমানুষ হিসেবে তুমি ঠিক কী রকম?

প্রবীর বলল, অর্থাৎ?

কোন মেয়েকে এই রকম পোশাকে দেখলে তোমার চোখ কি সব সময় লোভী হয়ে থাকে! না সাধারণ ভাবে কথা বলতে পারো?

প্রবীর সামান্য হেসে বলল, ঠিক জানি না। আমি অনুরোধ করবার আগেই কোন মেয়ে তো তার বাইরের পোশাক এরকম ভাবে খুলে ফেলে নি! আপতত আমি তোমাকে ভাল করে দেখছি।

তুমি যে স্বপ্ন দেখেছিলে, তাতে আমরা পরস্পরকে তুমি বলেছিলাম,তাই না?

হ্যাঁ। তুমি প্রথমেই বলেছিলে, তুমি কেন এত দেরী করে এলে?

সত্যিই প্রবীর, আমার জীবনে তুমি এত দেরী করে এলে কেন?

খুব বেশী দেরী তো হয় নি।

হা হা করে বেশ জোরে হেসে উঠল শকুন্তলা। হাসি যেন থামতেই চায় না।

একটু সামলে নিয়ে আবার বলল, কী রোমান্টিক কথাবার্তা! ঠিক যেন বাংলা সিনেমার মতন। তুমি মাইরি সত্যি একটা অদ্ভুত লোক। দু-এক ঘন্টার মধ্যেই আমার দিল্-এ চাক্কু চালিয়ে দিয়েছ!

প্রবীর বলল,আমি জানি তুমি ইংরেজি স্কুলে-পড়া মেয়ে। এক সময় পর্যন্ত খুব মেমসাহেব ছিলে। বিদেশ থেকে ফিরে খুব বাঙালী হয়েছ। এই ধরণের কথা যে তুমি নতুন বলতে শিখেছ তা তোমার উচ্চারণ শুনলেই বোঝা যায়।

বেটার লেট দ্যান নেভার। তুমি বুঝি খুব শুদ্ধ সংস্কৃতি টাইপের কথা বলা পছন্দ কর?

না। যার যা স্বাভাবিক, সেটাই আমার পছন্দ। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

একটা কেন, যতগুলো খুশি, সারা দুপুরটাই তো তোমাকে দিয়েছি।

এই বাড়িতে কি তুমি একা থাকো? এই বাড়িটা কেমন যেন বাংলা সিনেমার সেটের মতন। একজন মহিলা শিল্পী ....আর একটি মাত্র চাকর, আর কেউ নেই? কোন আত্মীয়-স্বজন?

এই বাড়িটা আমার নয়।

কার?

আমার ভূতপূর্ব স্বামীর। শুভব্রতর। ডিভোর্সের পর আমার এ বাড়িটা ছেড়ে দেবার কথা ছিল, কিন্তু এখানে আমার স্টুডিও, গোডাউন , সব সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ঝামেলা। তাই শুভব্রত আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছে। এর জন্য আমি মাসে মাসে ওকে আটশো টাকা ভাড়া দিই। অবশ্য অন্য লোককে ভাড়া দিলে এর বেশী পেতে পারত। পুরোনো বউকে শুভব্রত এই টুকু ফেবার করেছে।

বেশ বড় বাড়ি।

হ্যাঁ। শুভব্রতএখন থাকে ওর কোম্পানির দেওয়া ফ্ল্যাটে। এ বাড়িতেও একটা ঘর ও নিজের জন্য রেখে দিয়েছে, ভাড়াটেকে পুরো বাড়ির পজেশান দিতে নেই কি না। শুভব্রত মাসে একদিন দু'দিন এখানে থেকেও যায়। উই আর কোয়াইট ফ্রেন্ডলি। ধর এখন যদি শুভ্রব্রত হঠাৎ এসে পড়ে–

সে রকম আসার সম্ভাবনা আছে?

কেন, তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি?

ভয় নয়, একটা অপ্রীতিকর অবস্থা যদি হয়–

না। শুভব্রত এরকম অসময়ে কখনো আসে না। আমি বলছি, ধর দৈবাৎ যদি এসে পড়ে, তাহলেও তোমাকে দেখে সে একটুও বিরক্তি প্রবাশ করবে না। তোমার সঙ্গে গল্প করবে। সে অতি ভদ্র। বেশী মাত্রায় ভদ্র। বাই দা ওয়ে, তুমি শুভব্রতকেও চেনো নাকি?

না।

যাক, বাঁচা গেল।

তার মানে তুমি এত বড় বাড়িতে বলতে গেলে একাই থাকো?

তা নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে দেখছি। একা থাকতে আমার খারাপ লাগে না। আমার ভুতের ভয় নেই।

আর তোমার মেয়ে?

তুমি সে-খবরও রাখো! এটাও স্বপ্নে দেখেছ নাকি?

না। তবে জানা তো এটা অস্বাভাবিক কিছু না শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে তোমার জীবন বহু আলোচিত। তোমার একটি মেয়ে আছে শুনেছি।

এখন তার বয়েস তেরো। সে কার্শিংয়াঙে পড়ে। ছুটিতে আসে। আই অ্যাম আ ব্যাড মাদার। আমি মেয়ের খুবএকটা খোঁজ খবর নিতে পারি না। তবে ওর বাবা নেয়। আমার মেয়ে যখন ছোট ছিল, তখন ওর একটা মূর্তি করেছিলাম,দেখবে?

হ্যাঁ।

তাহলে ওপরে যেতে হবে। আমার বেডরুমে আছে। এসো।

তবে এখন থাক। পরে দেখব।

শকুন্তলা উঠে দাঁড়িয়েছিল, প্রবীরের কথা শুনে খুব অবাক হয়ে থমকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল।

তারপর হেসে উঠল প্রবলভাবে। হাসির তোড়ে তার বুকটা যেন এক্ষুণি ফেটে পড়বে।

প্রবীর মেয়েদের হাসির শব্দ খুব পছন্দ করে। এমন উচ্ছল হাসি খুব বেশি শোনা যায় না।

হাসি থামিয়ে শকুন্তলা বলল, সত্যি মাইরি, তুমি ভারি মজার লোক।

প্রবীর বলল, আমাকে দেখে যে তুমি মজা পাচ্ছ, এটা আমার পক্ষে খুবই আনন্দের

কথা।

মূর্তিটা আমার বেডরুমে আছে শুনে তুমি যেতে চাইলে না?

না, সে জন্য নয়।

ফাঁকা বাড়ি, একটি মেয়ে তোমায় বেড-রুমে নিয়ে যেতে চাইল, তবু তুমি যেতে চাইলে না? তুমি কী রকম কবি গো?

কবি মানেই বুঝি নেকড়ে বাঘ?

অন্তত পুরুষমানুষ তো হবে।

ফাঁকা বাড়িতে যে-কোন জায়গাই তো বেড-রুম হতে পারে তাই না?

তুমি কি সত্যি সত্যি ভেবেছিলে নাকি যে আমি ঐ রকম কিছু ভেবেই তোমায় বেড-রুমে নিয়ে যাবার কথাই বলেছিলুম?

তুমি সে-রকম কিছু মীন করনি নিশ্চয়ই, কিন্তু বেড-রুমে শুনলে আমার মনে ঐ রকম চিন্তাই আসে। আচ্ছা; তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তুমি বোধ হয় পুরোপুরি বাঙালী নও, তাই না।

পুরোপুরি মানে?

তুমি বাংলার বাইরে কোথাও মানুষ হয়েছ?

কি করে বুঝলে?

তোমার কথা....দু-একটা উচ্চারণ যেন অন্য রকম।

তোমার কান আছে বলতে হবে।

কবিদের তো ওটাই প্রধান সম্বল।

আমার মা ছিল গুজরাতি। আমি জন্মেছি আমেদাবাদে। তারপর বেশ কিছু দিন ছিলাম এলাহাবাদে। ওখানেই স্কুলে পড়েছি। অনেক দিন পর্যন্ত ভাল বাংলা বলতেই পারতুম না। পরে নিজের চেষ্টায় শিখেছি। আমার ধারণা ছিল, আমার বাংলায় এখন কোন ভুল নেই, কেউ ধরতে পারে না।

তোমার বাংলায় ভুল নেই, একটু টান আছে শুধু।

আমার বাবা খুব সাহেব ধরণের মানুষ। বাংলা খুব কম বলতেন, আর গুজরাতি তো শেখেনই নি। আমার মনে আছে, আমি বাবাকে একবার পরিনীতা শব্দটার মানে জিজ্ঞেস করেছিলুম, বাবা বলতে পারেননি। বাবা বললেন, দাঁড়া, সুধীনকাকাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করছি। বাবার এই সুধীনকাকা কে জানো? তোমাদের সুধীন দত্ত। কবি। কী চমৎকার চেহারা ছিল। আমি সুধীন দত্তের একটা মূর্তি গড়তে চেয়েছিলাম,কাজ শুরু করার আগেই উনি মারা গেলেন।

গ্রেট লস। তুমি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটা স্কাল্‌পচার করলে সেটা একটা সম্পদ হয়ে থাকত।

দেরী হয়ে গেল কেন জানো? আমি তখন কিঙ্করদার ছাত্রী, ওকে বলেছিলুম, উনি খুব একটা উৎসাহ দেখান নি। উনি বলেছিলেন, এখনইকী, আগে ভাল করে কাজ শেখো। আসলে, কিঙ্করদা পুরুষদের মূর্তি গড়া বেশী পছন্দ করতেন না। অনেকে জানে না, আমি কিঙ্করদার জন্য অনেকবার মডেল হয়েছি।

নুড?

আমি ভিয়েনার একজন শিল্পীকে জানি, যিনি শুধু যদি মুখটা স্টাডি করতে চান, তাহলেও মেয়েদের ন্যাংটো করে বসিয়ে রাখেন।

এ কথা বলার পর শকুন্তলা অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজল। তারপর চটের ড্রেসিং গাউনটা তুলে নিয়ে শরীরে জড়াল।

যদি তোমার গরম লাগে, তা হলে ওটা খুলে রাখতে পারো। আমার কথা বলতে

অসুবিধা হবে না।

তুমি আমার চোখের দিকে তাকালে না। তুমি আমার-শরীর দেখছো। আমার লজ্জা করছে।

সত্যি....মানে...লজ্জা করছে?

কেন। আমার কি লজ্জা সরম থাকতে নেই? আসলে আমি একা থাকি বলেই অনেক সময় অন্যমনস্কভাবে জামাকাপড় খুলে ফেলি তোমার মতন কোন পুরুষ একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে তখন খেয়াল হয় যে আমার শরীরটা আর সুন্দর নেই।

তুমি এখনো খুব সুন্দর। তোমার শরীরটা যেন কোনারক মন্দিরের কোন মূর্তির মতন।

থাক, আবার বাংলা সিনেমার মতন ডায়লগ দিতে হবে না।

তোমার বাবা-মা এখন কোথায়?

চুলোয় যাক আমার বাবা-মায়ের কথা। তুমি রিপোর্টারের মতন আমার জীবনী জেনে নেবার চেষ্টা করছ কেন? তোমার নিজের কথা কিছু বলছ না তুমি একজন কবি, ব্যস। হাওয়া থেকে জন্মেছ?

আমার জীবনে কোন গল্প নেই।

তুমি একটা মেয়েকে স্বপ্নে দেখেছ বলেই তার কাছে এসে ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছ? কেন, তোমার বাড়িটাড়ি নেই? কোন কাজকর্ম নেই?

সবই আছে।

তবে?

রোজ কেউ কাজ করে না, সারাক্ষণ কেউ বাড়িতে বসেও থাকে না। আমি তোমার কাছে বেড়াতে এসেছি।

সত্যি করে বল না, জার্মানির ঐ গল্পটা তুমি কার কাছে শুনেছ? আমার জীবনে একদিন যা ঘটেছিল, তা হুবহু অন্য কেউ স্বপ্নে দেখতে পারে? অসম্ভব! গাঁজাখুরি ব্যাপার।

সেদিন তুমি একলা ছিলে....

তা ছিলুম বটে, তবে পরে হয়তো আমি অন্য কারুকে ঘটনাটা বলেছিলুম.....তুমি তার কাছ থেকে শুনেছ!

অরিন্দমকে বলেছিলে?

না, ওকে বলি নি, এটা সিওর। ও তো সারারাত অজ্ঞান হয়েই রইল বলতে গেলে। আমি নদীর ধার থেকে যখন ফিরে এলুম, তখনও ও একই রকম ভাবে শুয়ে। ওকে আর ডাকি নি। পরদিন সকালবেলা ওর হ্যাংওভার কাটতে কাটতেই বেজে গেল বেলা এগারোটা। আমি তার আগেই সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে চলে গেছি। সন্ধ্যেবেলা ডিনার পার্টি ছিল, তারপর সেখান থেকে একজন আমাদের নিয়ে গেল লং ড্রাইভে, আমি গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম... তার পরদিনই তো ফেরা–।

ফিরে এসেও তো অরিন্দমের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে অনেকবার–

তা হয়েছে, কিন্তু ওকে সেই রাতের কথা আর কখনও বলি নি। সেই প্রসঙ্গ তুললে ও লজ্জা পাবে। কিন্তু সেই হোটেলে কি অন্য কোন চেনা লোক ছিল, যে আমায় দেখেছিল?

আমি অন্য কারুর কাছ থেকে এ ঘটনা শুনি নি?

তোমার দ্বিতীয় স্বপ্নটা এবার বল তো। দেখি এটা কতখানি মেলে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটা মিলবে না।

তার মানে?

তোমাকে নিয়ে দ্বিতীয় যে স্বপ্নটা আমি দেখেছি, সেটা প্রায় একই রকম,সেটা এখনো ঘটেনি। সেটা ভবিষ্যতের।

সেটা তোমার কল্পনা না স্বপ্ন?

স্বপ্ন।

দ্বিতীয়টা তুমি এখনো বলবে না?

এখনো সময় হয় নি।

শুভ্রব্রতর সঙ্গে খুব ঝগড়া হবার পর আমার খানিকটা নার্ভাস ব্রেক ডাউনের মতন হয়।

মেয়েকে নিয়ে আমি তখন শিমূলতলায় চলে যাই। অরিন্দম একটা বাড়ি ঠিক করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই বাড়িটায় ঢুকেই মনে হল, ওখানে আমি আগে থেকেছি। সিঁড়ি দিয়েই দোতলার ক'টা ঘর, কোথায় বাথরুম সব আমার আগে থেকে জানা। সামনের বাগানটাও আমার খুব চেনা। অথচ আমি জন্মে শিমূলতলায় যাইনি। পুরো জায়গাটাই আমার ভীষণ চেনা লাগছিল।

এরকম হয়, শুনেছি।

এটাও তোমার ঐ স্বপ্নের মতন নয়?

স্বপ্নে অচেনা কোন মানুষকে দেখেছ কখনো?

মনে তো পড়ে না।

আমি তোমাকে দেখেছি।

স্বপ্নে আমায় যেমন দেখেছিলে, তার তুলনায় আমায় এখন কী রকম দেখছ?

তোমায় আমি এখনো দেখি নি ভাল করে। দূর থেকে একটা পাহাড়কে দেখায় এক রকম, কাছে গেলে একদম অন্য রকম। দূর থেকে এক পলকেই গোটা পাহাড়টা দেখা হয়ে যায়। কাছে এসে দেখতে হয় অনেকক্ষণ ধরে।

দূর থেকে এক একটা পাহাড় দেখে আমার মনে হয় ওর আকৃতিটা একটু বদলে দিই। ওর মাথার দিকটা ভেঙে ওখানে একটা অন্য মাথা বসাই। তাহলে একটা চমৎকার কাজ হয়ে যাবে।

পাহাড়ের কাছে গেলেও কি সেই রকম মনে হয়?

প্রবীর, তুমি আমাকে খুব কাছ থেকে দেখবার চেষ্টা করো না। তাহলে দুঃখ পাবে।

হঠাৎ এ কথা?

আমি মেয়ে হিসেবে ভাল নই, আমি বিপজ্জনক। আমার কাছাকাছি যারা আসে তারা নিজেরাই ভেঙে যায়। এ রকম কয়েকবার হয়েছে।

এতক্ষণ বাদে, তোমাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে, শকুন্তলা। তুমি কি আমায় তোমার পাশে গিয়ে বসবার অনুমতি দেবে? আমি তোমাকে ছুঁয়ে কথা বলতে চাই।

ইডিয়েট, দরজায় খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ না? দেখো কে এসেছে, শম্ভু ফিরল বোধহয়।

প্রবীর উঠে গিয়ে সদর দরজা দেখে এসে বলল, না, শম্ভু নয়। একজন ফেরিওয়ালা।

কিন্তু প্রবীর নিজে থেকে শকুন্তলার পাশে বসল না।

শকুন্তলা প্রবীরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, একজন পুরুষ আর একজন নারী নিরালায় এক ঘরে বেশীক্ষণ এমনি এমনি বসে থাকতে পারে না, তাই না?

প্রবীর ইয়ার্কির সুরে বলল, শাস্ত্রে সেই জন্যই বলেছে, ঘি আর আগুন।

ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কে ঘি আর কে আগুন বল তো?

পুরুষ মানুষরাই তো শাস্ত্র লিখেছে, তাই আগুনই পুরুষ।

ভুল!

একালের কবিরা কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে আগুনেরই তুলনা দেয়।

একটা কথা বল তো প্রবীর। শিল্পী—সাহিত্যিকদের আড্ডায় নাকি আমার জীবন-কাহিনী নিয়ে আলোচনা হয়। আমার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? আমি যখন তখন যার তার সঙ্গে শুই?

তুমি সে রকমই একটা ইমেজ তৈরি করে রেখেছ বটে। তবে ইমেজের সঙ্গে তো আসল মানুষটা মেলে না।

তুমিও সেই ধান্দাতেই এসেছিলে আমার কাছে।

বারবার এই রকম ভাবে আমাকে গদ্যের চাবুক মারছ কেন? বেশী গদ্য আমার পছন্দ নয়

অর্থাৎ?

আমি শোওয়া-শুয়ির ধান্দায় যে-সে মেয়ের কাছে যাই না। কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হলে, তকে আমার ভাল লাগলে তারপর শোওয়ার কথা চিন্তা করি।

তুমি ওপরে আমার ঘরে গেলে দেখবে পিকাসো আর রঁদার দুটো বড় প্লাস্টার কাস্টিং আছে। আমি ওঁদের চুমু খাই মাঝে মাঝে। জড়িয়ে ধরি। রবীন্দনাথের এক একটা গান শুনলে মনে হয়, উনি আমায় আদর করছেন। এমন প্রায়ই হয়, আমার মনে হয়েছে, আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে আছি। আমার চেয়ে যাঁরা অনেক উঁচু স্তরের মানুষ, আমি তাঁদের সাহচর্যে আনন্দ পাই। সাধারণ পুরুষ মানুষের সঙ্গে শরীরচর্চা আমার পছন্দ নয়। তাদের গায়ের গন্ধই আমি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারি না।

জল যেমন জলকে চায়, মানুষও তেমনি মানুষকে চায়। ছবি, গান, মূর্তি -এ সব কারুর সর্বক্ষণের সঙ্গী হতে পারে না। দু-তিন মাস কোন মানুষকে, নারী-পুরুষ যে-ই হোক, অন্য কোন মানুষ যদি আলিঙ্গন না করে, তাহলে তার মনের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সে পুরোপুরি সুস্থ থাকে না।

বটে?

এটা তুমি অস্বীকার করতে পারো?

আমি একা থাকি। ডিভোর্সী মেয়েমানুষ, সুতরাং আমাকে আলিঙ্গন করার জন্য অনেকেই ব্যগ্র, তাই না?

আন-অ্যাটাচ্ড মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষদের বেশী আগ্রহ থাকে। তুমিই তো একটু আগে বললে। তুমি ঠিকই বলেছো অনেকটা

তোমারও সেই রকম আগ্রহ?

আমার থুতনিতে কারুর জুতো সুদ্ধ পায়ের লাথি খাবার সাধ নেই।

বালাই ষাট, তোমায় লাথি মারব কেন? তুমি আমায় স্বপ্নে দেখেছ,তুমি আমার মাণিক, এসো, হাত বাড়িয়ে আছি, আমায় আলিঙ্গন দাও!

এবার বোধহয় সত্যিই শম্ভু এসেছে। দরজায় শব্দ পাচ্ছি!

বেরসিক!

শম্ভুর কাছে চাবি থাকে, সে নিজেই দরজা খুলে ঢুকল। কাঁধে ঝোলানো থলি নিয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে বীয়ারের বোতল আর খাবারের প্যাকেট। বুদ্ধি করে সে বীয়ারের বোতল খোলার চাবিও এনেছে।

সব কিছু নামিয়ে রাখার পর শকুন্তলা শম্ভুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, হিসেব দে!

হোটেলের বেয়ারাদের মতন শম্ভু গড় গড় করে কতকগুলো অঙ্ক বলে গেল। তারপর পকেট থেকে বার করল পাঁচ টাকা।

শকুন্তলা বলল, শম্ভুকে যখনই কিছু আনতে দিই ও ঠিক পাঁচ টাকা ফেরত দেয়। যদি আরও অনেক কিছু আনতে বলতুম, তাহলেও ঐ পাঁচ টাকা ফেরত।

শম্ভু বলল, না দিদিমনি, আরও কুড়ি টাকা আছে, অন্য পকেটে।

শকুন্তলা বলল, সে কী রে! তাহলে তো আমি বড়লোক!

প্রবীর বলল,তোমার একলার সংসারটি বেশ ভালই চলে দেখছি।

শকুন্তলা শম্ভুকে বলল, যা, তুই এবার খেয়ে নে।

প্রবীর বীয়ারের বোতল খুলে জিজ্ঞেস করল,– শকুন্তলা তোমার গেলাস লাগবে?

শকুন্তলা বলল, নিশ্চয়ই। গেলাসের ওপরেই তো অনেকখানি নির্ভর করে।

দেয়াল আলমারি খুলে সে দুটি গেলাস বার করল। পাতলা ফিনফিনে কাচের, খুবই শৌখিন গেলাস।

শকুন্তলার ঘরটি যেমন অগোছালো, তাতে এ রকম গেলাস এখানে আশাই করা যায় না। মনে হয়, একটু শক্ত মুঠোয় ধরলেই ভেঙে যাবে।

খুব যত্ন করে ফেনা সরিয়ে বীয়ার ঢালল প্রবীর।

শকুন্তলা নিজের গেলাস উঁচু করে তুলে বলল, তোমার স্বপ্নের জন্য।

তারপর এক চুমুক দেবার পর বলল, এবার বল তো, প্রবীরকুমার , তুমি আর কোন্ কোন্ মেয়েকে নিয়ে এরকম স্বপ্ন দেখেছ?

প্রবীর বলল, আমি স্বপ্ন একটু বেশি দেখি। তার কারণ বোধহয়, আমর বায়ুরোগ আছে। সব স্বপ্নের মধ্যেই নারী পুরুষের চরিত্র থাকে। তবে তোমারটা যেমন পরিষ্কার ছবির মতন দেখেছি, সব স্বপ্ন সে রকম হয় না। আর তোমার মতন অচেনা মেয়েকে নিয়ে আমি একটাই শুধু স্বপ্ন দেখেছি, যতদূর মনে পড়ে।

সে মেয়েটি কে? বিখ্যাত কেউ?

তোমার চেয়ে অনেক বেশি বিখ্যাত।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, নাম বলো না, আমায় আন্দাজ করতে দাও:.....সুচিত্রা মিত্র?

ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সুতরাং তিনি অপরিচিতা নন। যাঁকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি সেই মহিলার নাম ইন্দিরা গান্ধী।

আচ্ছা! তা ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে কী স্বপ্ন দেখলে?

অনেকদিন আগের কথা, প্রায় বারো চৌদ্দ বছর হবে। মোট কথা সেই সময় ইন্দিরা গান্ধী সবে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন আমি তখন বরাকরে থাকি।

সেখানে কি করতে?

একটা চাকরি করতুম। বেশ সাধারণ চাকরি। দিশেরগড় বলে একটা জায়গা আছে, জানো? সেখানে। মাঝে মাঝে আমি গ্রামের দিকে যেতুম, মহুয়ার সন্ধানে। একদিন দেখলুম, একটা পুকুর থেকে স্নান করে উঠে আসছেন ইন্দিরা গান্ধী–মানে এটা স্বপ্ন–ইন্দিরা গান্ধী একদম একা, কোন বডি-গার্ড নেই, সেক্রেটারি-ফেক্রেটারি কেউ নেই, ভিজে কাপড়ে উনি উঠে এসে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন– যেন আশা করেছিলেন তোয়ালে আর শুকনো পোশাক কেউ এগিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ এলো না। উনি অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে লাগলেন, শুধু তাই নয়, এক সময় দেখলুম,উনি ছেলেমানুষের মতন কাঁদছেন।

তখন তুমি নিয়ে এলে তোয়ালে?

না। এই স্বপ্নে আমি কোথাও ছিলুম না। শুধু ওঁকে একাই দেখেছি। কেন যে আমি এ রকম স্বপ্ন দেখি, তার কোন মাথা মুন্ডু বুঝি না।

তারপর কি তুমি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিলে? ওঁকে বলেছিলে, ম্যাডাম, আমি আপনাকে এই রকম অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছি।

উনি আমায় পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবতেন না তাহলে।

তবে তুমি আমার কাছে এলে কেন? আমিও তো তোমায় পাগল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। আমার কাছে না এসে তোমার উচিত ছিল কোন পাগলের ডাক্তারের কাছে যাওয়া।

তোমার কাছে এলাম...... তার কারণ......তুমি ইন্দিরা গান্ধীর মতন অনধিগম্য নও, তাছাড়া......তুমি সেই স্বপ্নের মধ্যে আমাকে বলেছিলে, তুমি এত দেরী করে এলে, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। স্বপ্নটা দেখার পর প্রায় একমাস ধরে চিন্তা করলুম.....আজ সকালেই হঠাৎ মনে হল, সত্যিই হয়তো আমার সঙ্গে তোমার অনেক কথা থাকতে পারে। সেই জন্যই এলুম।

তোমাকে আমি চিনি না, অথচ তোমার সঙ্গে আমার কী করে কথা থাকবে?

চেনা অচেনাটা কোন ব্যাপারই নয়। কারুকে না কারুকে তো কিছু বলতে হবে।

আমি কথা বলি মাটির সঙ্গে, পাথরের সঙ্গে, দেয়ালের সঙ্গে, এমন কি আমার বারান্দার টবে যে গাছগুলো আছে, তাদের সঙ্গেও। তারা আমার কথা বোঝে। মানুষ বোঝে না!

মানুষ তো অনেক রকম।

আমি অনেক দেখেছি।

তোমার কোন মেয়েবন্ধু নেই? কোন প্রাণের বান্ধবী?

আমার মতন মেয়ের সঙ্গে অন্য কোন মেয়ের বন্ধুত্ব হতে পারে না। জানো, এক সময়,

বছর পাঁচেক আগে, কোন একটা কারণে আমি সম্পূর্ণ পুরুষ জাতটার ওপরই এমন রেগে গিয়েছিলুম যে তখন ভেবেছিলুম, ও শালাদের আর কোনদিন ছুঁয়েও দেখব না। তাই লেসবিয়ানিজম ট্রাই করেছিলুম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ জিনিসটা আমার মধ্যে নেই। একদম নেই। একটুও আনন্দ পেলুম না। কেমন যেন ঘেন্না ঘেন্না করছিল।

পুরুষ জাতের ওপর রাগ হয়েছিল কেন?

কেন শুনবে? ওরা মেয়েদের স্বাধীনতার কোন মূল্য দিতে চায় না। কত পুরুষ যেমন একা স্বাধীনভাবে থাকে ঠিক সেইরকম ভাবে থাকার যোগ্যতা আমার আছে। আমি নিজে যথেষ্ট রোজগার করি, নিজের সব কাজ নিজে চালিয়ে নিতে পারি। আত্মরক্ষার ক্ষমতাও আমার আছে। তবু কেউ না কেউ এসে বলবে, ইস, তুমি একা আছ। তোমার নিশ্চয়ই কোন সাহায্যের দরকার। কিংবা তোমার নিশ্চয়ই কোন প্রেমিক দরকার, কাঁচা বাংলায় যাকে বলে নাঙ। কোন পুরুষ যদি একা থাকে,মেয়েরা কি সেধে সেধে গিয়ে এরকম কথা বলে? মহা খচ্চর এই পুরুষগুলো!

তুমি পুরুষদের এত গালাগালি দিচ্ছ, আমিও তো তাদেরই একজন প্রতিনিধি।

তোমাকে বাদ দেবার কোন কারণ তো এখনো ঘটে নি?

তুমি যখন আলখাল্লাটা খুলে রেখেছিলে–

তুমি কি ভাবছো, সেটা তোমাকে লোভ দেখাবার জন্য? আমার শরীরটা এমন কিছু লোভনীয়ও নয়।

আমাকে লোভ দেখাবার তো কোনো দরকার নেই। আমি তো যেচেই তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি।

তবে পুরুষদের আমি ভালও বাসি। এক একটা পুরুষ খুব হাড় হারামজাদা হয় বটে, তবু খুব ইন্টরেস্টিং। এক একটা পুরুষের চরিত্রে তিন রকম দিক আছে, মেয়েদের তা থাকে না সাধারণত। অধিকাংশ মেয়েই একমুখী। দিল্লিতে যখন আমার 'সূর্যের রত" মুর্তিটা বসানো হয়, সেই সময় একটা বেশ বড় ফাংশান হয়েছিল, তাতে আমি একজনকে দেখি, ভদ্রলোক কাশ্মীরী, এরকম নির্লজ্জ মেয়েবাজ আর হয় না, প্রত্যেকটা মেয়ের সঙ্গে একই রকম ন্যাকামি করছে, তবু লোকটা কী লাভবর্ল, ওর দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না। মনে কর, একটা বড় লোমওয়ালা সাদা ফুটফুটে কুকুর, দারুণ দুষ্টু, এটা ভাঙছে, ওকে তাড়া করছে, তবু যেমন তাকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। অনেকটা সেই রকম।

ধন্যবাদ।

কিসের জন্যে?

পুরুষমানুষদের প্রশংসা করবার জন্য। দিল্লিতে তোমার 'সুর্যের রথ" আমি দেখেছি। অপূর্ব সুন্দর কাজ। কী ম্যাসিভ! তবু মনে হয় ঠিক যেন উড়ে যাচ্ছে।

এই প্রথম তুমি আমার কোন কাজের প্রশংসা করলে।

আমি মাত্র দু-তিনটিই দেখেছি।

আমি অবশ্য তোমার কোন লেখাই পড়ি নি।

তাতে তোমার আত্মার কোন ক্ষতি হয় নি।

কিন্তু আমি পড়তে চাই। তোমার বই আমাকে দেবে?

অর্থাৎ এর পরেও তুমি আমায় আসতে বলছ।

তুমি যা নাছোড়বান্দা পার্টি, আমি না বললেও তুমি ঠিকই আসতে।

প্রবীর হো হো করে হেসে উঠল।

শকুন্তলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বস, একটু আসছি।

দরজা টেনে সে বাইরে চলে গেল। প্রবীর নিঃশব্দে চুমুক দিতে লাগল বীয়ারে।

আজ সকাল থেকে সে নিজের ব্যবহারে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। আজ সে যেন একজন নতুন মানুষ। এর আগে কারুর সঙ্গে সে সেধে আলাপ করতে যায় নি। ফাঁকা বাড়িতে এরকম একটি মেয়ের সঙ্গে বসে বসে সে বীয়ার খাচ্ছে, কিন্তু এখনও প্রবীর সেই মেয়েটিকে বুকে হাত দেয় নি, কিংবা দেবার চেষ্টা করে নি, এ তো প্রায় অবিশ্বাস্য।

কিন্তু প্রবীর বেশ উপভোগ করছে এই সংযম। এর মধ্যে বেশ কিছুটা পবিত্রতা বোধ আছে। অবশ্য কতক্ষণ সে এ রকম পারবে, তা সে নিজেই জানে না।

শকুন্তলা ফিরে এলো, হাতে একটা বেশ বড় সাইজের বাঁধানো খাতা। সেই খাতাটা দিয়ে প্রবীরের মাথায় আলতো করে একটা চাটা মেরে বলল, এ কী, খাবার খাচ্ছ না কেন? খাও, সব যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

প্রবীর বলল, তুমিও কিছু খাও নি। এসো, কিছুটা খেয়ে নেওয়া যাক। খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, এদিকে বীয়ারও গরম হয়ে যাচ্ছে!

শকুন্তলা মেঝেতে বসে পড়ে বলল, তুমি কী মাইরি! সেই সকালবেলা এসেছ, এর মধ্যে একবার বাথরুমেও গেলে না?

প্রবীর বলল, একবার গিয়েছিলুম, ঐ যে তুমি আমার মুখে মাটি ছুঁড়ে মারলে? সেই কাদা ধোবার জন্য....

আমি তোমায় মাটি ছুঁড়ে মেরেছিলুম? কখন? ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। এক এক সময় আমার এমন রাগ চড়ে যায়..তুমি যেন কী একটা বাজে কথা বলেছিলে সেই সময়।

ভাগ্যিস কাদা ছুঁড়ে মেরেছিলে! সেই জন্যই তো তোমার সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি ভাব হল।

ভাব হয়েছে নাকি এখনো?

তুমি আমাকে তাড়িয়েই দিচ্ছিলে, তার বদলে এখন পাশাপাশি বসে বীয়ার খাচ্ছি, একে ভাব বলে না?

মানুষ আসলে মানুষকে বিশ্বাস করে না। দুজন অচেনা মানুষ কাছাকাছি এলে প্রথম প্রথম কেমন যেন শত্রুর মতন ভাব করে থাকে। মুখে হাসি মাখা থাকলেও একজন সব সময় বুঝতে চেষ্টা করে অন্য ব্যাটার মতলব আসলে কী? জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের খুব বেশি তফাত নেই।

ঐ মুখের হাসিটাতেই তফাত।

হ্যাঁ, তা ঠিক। একমাত্র মানুষই ভেতরে ভেতরে শত্রুতা করেও মুখে হাসতে পারে।

তুমি কি এখনো ভাবছ, আমার আসল মতলবটা কী?

এখনো খানিকটা ধাঁধার মধ্যে আছি, তা ঠিকই। তুমি জোচ্চোর কিংবা নেকড়ে বাঘ নও, তা বুঝেছি, কিন্তু কোন টানে তুমি আমার কাছে এসেছ......

সঠিক কোন যুক্তি আমি দিতে পারব না। তুমি তোমার সব রকম ব্যবহারের যুক্তি দিতে পারো? স্বপ্নের যেমন যুক্তি নেই।

এসো, তোমায় আমার এই খাতাটা দেখাই। কাছে সরে এসো, আমার গেলাসে আর একটু বীয়ার ঢেলে দাও।

শকুন্তলা খাতাটা খুলল।

প্রথম পাতায় একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাহাড় আর শাল বন। জল রঙে আঁকা। কাঁচা হাতের কাজ, পরিষ্কার গোপাল ঘোষের অনুকরণ।

শকুন্তলা বলল, এটা আমার সতেরো বছর বয়েসে আঁকা। আরও অনেক ছোট বয়েস থেকে আমি ছবি আঁকি। কিন্তু আগেকার কিছু নেই। কিন্তু এই খাতাটায় আছে আর সতেরো থেকে উনিশ বছর বয়েস পর্যন্ত আঁকা ছবি কয়েকটা। এই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। আঃ এখনো সেই বয়েসটার কথা ভাবতেই আমার কষ্ট হয়। সেই সময় একবার দুমকা গিয়েছিলুম, এই ছবিটা সেখানেই আঁকা। আমি সে বছর প্রথম শাড়ি পরেছি, এলাহাবাদে

থাকার সময় আমি শালোয়ার–কামিজ পরতুম। একটা ছোট্ট টিলার ওপর বসে সারা দুপুর ধরে একা একা এঁকেছিলুম, দারুণ রোদ ছিল, অথচ একটুও কষ্ট হয়নি।

সেই ছবিটা খুব সুন্দর।

কোন ছবিটা?

একটি সতেরো বছরের মেয়ে টিলার ওপর বসে মগ্ন হয়ে ছবি আঁকছে।

আর আমার আঁকা ছবিটা বুঝি ভাল হয়নি?

সতেরো বছরের মেয়ের আঁকা হিসেবে খুবই ভাল বলতে হবে।

তুমি খুব পোলাইট। আচ্ছা, এর পরের ছবিটা কেমন বল তো?

পরের ছবিটি একেবারে অন্য রকম। দাড়িওয়ালা এক ক্লান্ত বৃদ্ধের আবক্ষ মূর্তি, কাঁচা ইঁটের মতন লাল রঙের ব্যবহারই বেশি।

সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে ধরে হাসি মুখে শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে রইল প্রবীর!

শকুন্তলারও ঠোঁটে চাপা হাসি। সে জিজ্ঞেস করল, এ ছবিটা কেমন লাগছে বল?

প্রবীর হাসতে হাসতে বলল, রুয়ো'র 'ওল্ড কিং-এর খুব চমৎকার কপি করেছ।

সত্যিকারের বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল শকুন্তলার মুখে। প্রবীরের চোখে গাঢ় দৃষ্টি রেখে সে বলল, তুমি দেখছি ছবির ব্যাপারে একেবারে গবেট নও। রুয়ো'র ছবি দেখে চিনতে পারো–

প্রবীরের কাঁধে হাত রেখে শকুন্তলা বলল, এ জন্য তোমায় একটা চুমু দিতে পারি–

শকুন্তলা মুখটা এগিয়ে আনলেও প্রবীর স্থির থেকে বলল, এখন নয়। তুমি যে আমাকে ছুঁয়েছ, সেটাই যথেষ্ট

শকুন্তলা দ্বিতীয়বার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এ আবার কী ধরনের ন্যাকামি? তুই শালা কি চুমু খেতেও জানিস না নাকি? ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানিস না?

সব কিছুর জন্যই একটা বিশেষ সময় আছে তো?

এটা চুমু খাবার সময় নয়? বীয়ার ভেজা ঠোঁটে চুমু খেতেই তো সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে।

প্রবীর ইঙ্গিতপূর্ণ স্বরে বলল, না। এখনো সময় হয়নি।

হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠল শকুন্তলা। সে কোথায় যেন আহত হয়েছে।

হাঁটুতে ভর দিয়ে আধ-বসা হয়ে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, আজ শালা তোকে আমি জোর করে চুমু খাব। মেয়েদের একলা পেলেই ছেলেরা যেমন জোর করার চেষ্টা করে ...আজ আমিও...। একটা বেশ লালটু মার্কা ছেলে পেয়েছি–

শকুন্তলা এগিয়ে আসতেই প্রবীর বেশ দৃঢ় গলায় ধমক দিয়ে বলল, ও রকম কোরো না, শকুন্তলা, শান্ত হয়ে বসো!

একটু থমকে গিয়ে শকুন্তলা বলল, এ সব কী হচ্ছে বল তো?

প্রবীর গলার আওয়াজ বদলে কৌতুক সুরে বলল, যেমন রহস্যময়ী নারী হয়, সেই রকমই আমি এক রহস্যময় পুরুষ ধরে নাও। বরং তোমার ছবি দেখাও।

দূর ছাই।

খাতাখানা ছুঁড়ে ঘরের এক কোণে ফেলে দিল শকুন্তলা। তারপর সে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজল।

এখন শকুন্তলার চুলে হাত বুলিয়ে মান ভঞ্জন করা উচিত প্রবীরের। শকুন্তলার চুল বব করা। তার পরিচ্ছন্ন ঘাড়ে বয়েসের রেখা এখনো বোঝা যায় না। হাউস্ কোটটা পরবার জন্য তার পিঠের শোভা আর এখন দেখা যাচ্ছে না।

প্রবীর কিন্তু শকুন্তলাকে স্পর্শ করল না। সে উঠে গিয়ে ছবির খাতাটা কুড়িয়ে এনে পাতা ওল্টাতে লাগল। এক একটা ছবি এক এক রকম। কোন ছবিই শকুন্তলার ঠিক নিজস্ব নয়, বিখ্যাত সব শিল্পীদের অনুকরণ। একটা বয়েসে সব শিল্পীই এ রকম করে। কপি করার

ব্যাপারে শকুন্তলার বেশ দক্ষতা আছে।

একটু বাদে মুখ তুলল শকুন্তলা। তার চোখের পাতায় সামান্য জলের আভাস।

উদাসীন গলায় সে বলল, সেই সতেরো বছর বয়েসে, কী সুন্দর ছিল জীবনটা–

প্রবীর বলল, ঐ বয়েসটা তোমার খুব প্রিয়?

তোমার প্রিয় নয়? উনিশ বছর পর্যন্ত, যতদিন কোন পুরুষমানুষ আমায় এটো করে নি, ততদিন আমি কত পবিত্র, কত নির্মল ছিলুম। ঠিক যেন একটা পাহাড়ী নদী......

পুরুষ তোমায় এটো করে নি। শরীর হচ্ছে অমৃত, তা কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না। উচ্ছিষ্ট যদি কিছু হয়, তা হল মন। তুমি পুরুষদের নামে দোষ দিচ্ছ। কিন্তু তুমি পুরুষদের মনে মনে চাইতে না? সব মেয়েই ঐ বয়েসে ভাবতে ভালবাসে যে কোন এক প্রিন্স চার্মিং আসবে, তার শরীর আদরে ভরিয়ে দেবে!

তুমি কী করে তা জানলে? তুমি তো মেয়ে নও।

কবিরা সব জানে। এই অপার খলু সংসারে কবিরাই তো প্রজাপতি।

অনেক উচ্চিংড়ে-মার্কা কবিও আমি দেখেছি। ও সব বাকতাল্লা ছাড়! সতেরো বছর বয়েসটা তোমার কেমন লাগে?

কিশোর কিংবা প্রথম যৌবনের স্মৃতি আমার কাছে খুব একটা মধুর নয়। বেশ গরিব ছিলাম, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, সে সব বাদ দিলেও তখন অনুভূতি যেন তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না। বরং আমার মনে হয়, এই বয়েসে, বিশেষত ছেলেরা, যেমন হুট করে পরের কথায় মেতে উঠে এক কথায় প্রাণ দিতে পারে, তেমনি আবার খুবই স্বার্থপরও হয়।

শকুন্তলা তৃষ্ণার্তের মতন এক চুমুকে এক গেলাস বীয়ার শেষ করে ফেলে বলল, আবার ভরে দাও! অনেকদিন আমি এরকম ভাবে কাজ থেকে ছুটি নিই নি। তুমি কি আমায় হিপনোটাইজ করেছ?

হ্যাঁ করেছি।

তোমার ক'টি ছেলে মেয়ে, প্রবীর?

আমি যে বিয়ে করেছি, সে কথা তো এখনো বলি নি।

তবে কি আল্লার ষাড় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

কবিদের স্ত্রী পুত্র পরিবার ঘর সংসার কিছু থাকতে নেই।

ফের আঁতলামি করছ? শালা, তুই রবিঠাকুরের চেয়ে বড় কবি? তাঁর ঘর-সংসার ছিল না? তোর বাড়ি কোথায় বল আগে?

এখনো বলার সময় হয় নি। আগে দ্বিতীয় স্বপ্নটার কথা মিটে যাক।

সেটা কখন শোনানো হবে?

হয়তো আজ আর হবে না।

সত্যি আমায় চোখে দেখার আগে তুমি আমায় নিয়ে দু'দুটো স্বপ্ন দেখেছ?

তৃতীয় স্বপ্ন দেখি কিনা তার জন্য কুড়ি পঁচিশ দিন অপেক্ষা করেছি। আর দেখি নি। আজ সকালে হঠাৎ মনে হল, তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

আমার দু-একজন ছেলে বন্ধু বলেছে,তারা অল্প বয়েসে নাকি সিনেমার নায়িকাদের স্বপ্ন দেখত। স্বপ্নে তাদের উত্তেজনা হত। কিন্তু সে তো অল্প বয়েসের। তাছাড়া সিনেমার মেয়েছেলেদের যে সব জিনিস থাকে, তা আমার কিছুই নেই। আমার চেয়ে ভাল চেহারার মেয়ে তুমি ঢের দেখেছ!

দুটি স্বপ্নেতেই আমি তোমায় খুব মন খারাপ অবস্থায় দেখেছিলাম।

খুব রেয়ার, খুব রেয়ার! আমার মন খারাপ সহজে দেখা যায় না।

কিন্তু স্বপ্নে আমি তাই-ই দেখেছি।

জানো, আমার যখন সতেরো বছর বয়েস, আমি খুব লাজুক ছিলুম তো তখন....

তুমি লাজুক ছিলে?

এখন বিশ্বাস করতে পারছ না তো? এখন অনেক পোড় খেয়ে ঝানু হয়েছি। কিন্তু সত্যিই আমি এক সময় খুব লাজুক ছিলুম, একদিন মনে আছে, আমার বাবা অন্যায় ভাবে আমায় বকুনি দিয়েছিলেন, অভিমান-লজ্জায়-কান্নায় মিশে আমি কোন উত্তর দিতে পারি নি.. সেই দিন আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম, আমার বাবা খুব গরিব হয়ে গেছেন, ময়লা জামা কাপড় পরে একটা অফিসে চাকরি চাইতে গেছেন, আর আমিই সেই অফিরেসর ম্যানেজিং ডিরেক্টার...হাঃ হাঃ..হাঃ.... স্বপ্নে এমন সব গাঁজাখুরি ব্যাপার হয়! আশা কিরি ফ্রয়েডের বইতে এই সব স্বপ্নেরও ব্যাখ্যা আছে। ফ্রয়েড তো সব ব্যাপারটাই বিপ্রেস্‌ড সেক্স বলে চালিয়ে দিয়েছে!

শকুন্তলা, তুমি একজন শিল্পী, তোমার মনে হয় না যে বড় বড় শিল্পীদের সব রচনাই স্বপ্নের মতন? সালভাদোর ডালির ছবিগুলো তো সবই আমার স্বপ্ন বলে মনে হয়।

ও ব্যাটা মহা শয়তান। ও শিল্পী নয়, ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, কিংবা বলতে পারো শেয়ানা পাগল! ওসব কথা থাক। একটা ভাল কথা মনে পড়েছে। তুমি তখন বলছিলে, অরিন্দমের ডিভোর্সের ব্যাপারে তোমার একটা ভূমিকা আছে.....

অরিন্দম তাই মনে করে।

তুমি কুহুকে কত দিন ধরে চেনো?

ওর যখন সতেরো বছর বয়েস।

তুমি ওর জীবনে প্রথম পুরুষ? আমি শুনেছিলুম যে বিয়ের আগে একজনের সঙ্গে কুহুর খুব প্রেম ছিল। তারপর অরিন্দম এসে পড়ে, এক রকম কুহুকে চিনিয়ে নিয়ে ওকে বিয়ে করে।

আমি কুহুর প্রেমিক ছিলুম না। বাদল রহমান আমার বন্ধু, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য কুহু আমার বাড়িতে আসত। কিন্তু কুহুর একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল। ও এমন ভাব দেখাত, যেন আমার প্রতিই ওর বেশি দুর্বলতা। এই জন্য অরিন্দম আর বাদল দুজনেই আমার ওপর চটা। কুহুর এই ব্যবহারের আমি মানে বুঝতে পারি না।

হয়তো তোমাকেই কুহুর বেশী পছন্দ ছিল। তুমি বুঝতে পারো নি।

না, সেটুকু বোঝার মতন বুদ্ধি আমার আছে। কুহু সাবধানী মেয়ে, সে জানে আমার মতন পুরুষের ওপর কখনও নির্ভর করা যায় না।

কেন?

আমি সেই রকমই।

তুমি শুধু মধু খেতে জানো? এই যে একটু আগে বললে, কবিরা প্রজাপতি না কী যেন হয়।

সে প্রজাপতি মানে অন্য।

জ্ঞান দিও না। তা আমি জানি। তুমি বলতে চাও, তুমি কুহুকে নিয়ে কিছু কর নি?

এটা জানা তোমার খুব দরকার?

হ্যাঁ।

অরিন্দমের সঙ্গে ঝগড়া করে কুহু একদিন আমার কাছে চলে এসেছিল। হয়তো এসেছিল বাদলের জন্যই, কিন্তু বাদল তখন কুয়াইত গেছে। কুহু অবশ্য এমন ভাব দেখাল যে ও আমার কাছে আশ্রয় নেবার জন্যই এসেছে। আমি কুহুর সঙ্গে অত্যন্ত মধুরভাবে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলুম।

কী করেছিলে?

সেটা তুমি শুনবেই?

হ্যাঁ।

সে রাতে আমি খুব ড্রাঙ্ক ছিলুম, আমি কুহুকে আমার বিছানায় নিয়ে শুয়ে পড়লুম। তারপর ঐ ব্যাপারটা হয়ে যাবার পর আমি টেলিফোনে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে এক ঘন্টা ধরে প্রেমের কথা বললুম। কুহু তখনও পাশে শুয়ে। কুহু তার রূপ দিয়ে আমায় ভোলাতে চেয়েছিল, আমি তাকে আমার মন দেব কেন?

বেশ করেছ!

কুহুর ওপর তোমার রাগ আছে দেখছি!

হ্যাঁ আছি। কেন জানো? কোন পুরুষমানুষ ঘটিত কারণে নয়। আমি এক সময় কুহুকে খুব পছন্দ করতুম। আমি তার একটি মূর্তি গড়ার জন্য ওকে ন্যুড মডেল হতে বলেছিলুম। কুহু তো রাজি হলই না, বরং রেগে গেল। আমি নাকি তাকে অপমান করেছি। আরে গেল যা! অত রূপ নিয়ে জন্মেছিস, সেই রূপ যদি শিল্পের প্রয়োজনে না লাগে, তাহলে ঐ রূপের মানে কী? সে তোমার মতন একজন পর পুরুষের সঙ্গে যখন ঐ ব্যাপারটা করেছিল, তখন নিশ্চয়ই জামা-কাপড় সব খুলেছিল। আর আমার সামনে খুলতে পারে না? একে ন্যাকামি ছাড়া আর কী বলব?

কিন্তু ওরকম মূর্তি গড়া মানে তো, সবাইকে জানিয়ে দেওয়া।

সো হোয়াট?

তোমার কাছে পোজ দিতে রাজি না হয়ে কুহু বোকামিই করেছে। ওর রক্ত-মাংসের রূপ অমর হতে পারত।

যাক গে যাক, চুলোয় যাক। বাদল রহমানকে বিয়ে করে কুহু সুখে থাকুক। তিন চারটে কাচ্চা বাচ্চা হোক! আর বীয়ার আছে?

আর একটা বোতল আছে।

দাও, আমায় দাও। খাবার-দাবার তো কিছুই খেলে না।

আমার ঘুম পাচ্ছে।

তুমি ঘুমোবে?

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি চলে যেও না।

আমি আরও...মানে, তুমি ঘুমিয়ে পড়লেও আমি বসে থাকব?

হ্যাঁ থাকবে। এই আমার অর্ডার।

পর পর দু' গেলাস বীয়ার লম্বা চুমুক দিয়ে শেষ করে শকুন্তলা যেখানে বসে ছিল সেখানেই গা এলিয়ে দিল। তার মাথাটা এসে পৌঁছল প্রবীরের উরুর প্রায় কাছে। প্রবীর কিন্তু শকুন্তলার মাথা রাখবার জন্য নিজের উরু এগিয়ে দিল না।

তার বদলে প্রবীর বলল, শকুন্তলা, তোমার ঘুম পেয়েছে, তুমি ওপরে গিয়ে শোও, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

শকুন্তলা জড়ানো গলায় বলল, কেন রে, শালা! এটা তোর বাড়ি না আমার বাড়ি? আমার যেখানে ইচ্ছে সেখানেই শুয়ে থাকব।

জ্বলন্ত সিগারেটটা হাত থেকে খসে পড়ল শকুন্তলার। সে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রবীর সিগারেটটা তুলে রাখল অ্যাসট্রেতে। তারপর কিছুক্ষণ সে একেবারে নিথর হয়ে বসে রইল।

সারা বাড়ি একেবারে নিঝুম। শম্ভূ কোথায় থাকে কিংবা বাড়িতেই আছে কি না তা বোঝাবার উপায় নেই। দরজাটার এক পাল্লা ভেজানো।

প্রবীরের সামনে ঈষৎ নেশাগ্রস্ত এক রমণী শুয়ে আছে। হাউস কোটের বোতাম আঁটেনি শকুন্তলা, ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার ব্রা। প্রবীরের সামনে, বলতে গেলে, এক কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু এ পরীক্ষায় সে অনায়াসে পাশ করবে। আজকের দিনটা তো অন্য কোন দিনের মতন নয়। আজ সে অন্য মানুষ।

সাধক-টাধকরা যেমন যুবতী নারী সামনে রেখেও সংযমের ঘটা করে, প্রবীরেরও যেন সেই রকম অবস্থা। এই কথাটা মনে পড়তেই হাসি পেল তার। প্রবীর মজুমদার একজন সাধক। এর চেয়ে হাসির কথা আর হয় না।

একটু বাদেই পাখা থেমে গেল। প্রবীর ঘড়ি দেখল। পৌনে চারটে বাজে। কথায় কথায় অনেক সময় কেটে গেছে। লোড শেডিং বেশীক্ষণ থাকলে এখানে থাকা অসহ্য হবে।

পাখার হাওয়া থেমে গেছে বলেই কোথা থেকে একটা মাছি চলে এসেছে। সেটা অবাধ্যের মত ভন্ ভন্ করছ শকুন্তলার মুখের ওপর।

হাত দিয়ে মাছিটাকে তাড়াতে গিয়ে একবার শকুন্তলার ঠোঁটে আল্‌তো ভাবে হাত লেগে গেল প্রবীরের। কিন্তু শকুন্তলার ঘুম ভাঙে নি।

তখন একটা কথা মনে পড়ায় হাসি পেয়ে গেল প্রবীরের।

কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে এই রকম একটা দৃশ্য আছে না? একটা ভ্রমর উড়ছিল শকুন্তলার মুখের সামনে, যেন সে শকুন্তলার ওষ্ঠে চুম্বন করতে চাইছে। তা দেখে রাজা দুষ্মন্তের মনে হল, ঐ ভ্রমরটা তার চেয়েও ভাগ্যবান। এ যে প্রায় সে রকম অবস্থা!.

প্রবীর ভাবল, আর যা-ই হোক, সে রাজা দুষ্মন্ত নয়। তবু শকুন্তলার এতখানি সান্নিধ্যে বেশিক্ষণ বসে থাকা যাবে না।

শকুন্তলা ইচ্ছে করেই খারাপ কথা বলে, অনেকটা পুরুষালি ব্যবহার করে যেন প্রমাণ করতে চায় সে পুরুষদের সঙ্গে সমান। কিন্তু তার ঘুমন্ত মুখখানিতে ফুটে উঠেছে অসহায় সারল্য।

শকুন্তলা তাকে অপেক্ষা করতে বলেছে। তা বলে যে প্রবীরকে থাকতেই হবে, এমন কোন ব্যাপার নেই। আজ সে অন্য কারুর ইচ্ছে অনিচ্ছে অনুসারে দিন কাটাবার জন্য এখানে আসে নি। আজ সে এসেছে সম্পূর্ণ নিজের খেয়ালে।

মেয়েটার সাহস আছে বলতে হবে। অমন নিশ্চিন্তভাবে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল? দু-আড়াই বোতল বীয়ার খেয়ে এতটা নেশা? প্রবীর যদি সত্যিই কোন প্রতারক হত, তাহলে তো সে এই সুযোগে শকুন্তলার যথাসর্বস্ব, এমন কি নারীত্ব পর্যন্ত লুটেপুটে নিয়ে যেতে পারত।

স্টুডিও ঘরটার বাইরে বেরিয়ে এলো প্রবীর।

বাইরে বেশ লম্বা টানা বারান্দা। এক কোণে বাথরুম, অন্য কোণে রান্নাঘর। স্টুডিও ঘরের পাশে আর একটি তালাবন্ধ ঘর।

শম্ভুর কোন পাত্তা নেই।

প্রবীর সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দোতলায়। এক পাশে ছোট্ট ছাদ।

অন্য পাশে পাশাপাশি দুখানি ঘর। এখানে প্রত্যেক ঘরের দরজা খোলা। এর মধ্যে একটি শকুন্তলার শয়নকক্ষ নিশ্চয়ই।

দুটি ঘরেরই দরাজা খুলে বাইরে থেকে উকি দিয়ে দেখল প্রবীর। একটা ঘর বই পত্রে ঠাসা। অন্য ঘরটিতে বিখ্যাত সব শিল্পীদের আত্ম-প্রতিকৃতির ছবি অথবা তাঁদের চেহারার প্লাস্টার কাষ্টিং। এখানেই তাহলে শকুন্তলা শোয়, সে রাত কাটায় এই সব বিখ্যাত লোকদের সংস্পর্শে।

প্রবীর কিন্তু সে ঘরে ঢুকল না। বরং সে বইয়ের ঘরে ঢুকে পড়ল।

তিনতলায় একটি ঘর আছে। সেটি নিশ্চয়ই শকুন্তলার প্রাক্তন স্বামী অর্থাৎ এ বাড়ির মালিকের। বিচিত্র সব ব্যাপার।

বইয়ের র‍্যাকে চোখ বুলোতে বুলোতে এক জায়গায় প্রবীরের চোখ আটকে গেল। কহ্‌লিল জিব্রানের একটি চিঠিপত্রের সংকলন। মেরি হ্যাসকেলকে লেখা। বইটার কথা প্রবীর শুনেছে কিন্তু আগে দেখে নি। বইটি টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাকে ওল্টাতে প্রবীর বিভোর হয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ফেলল খানিকটা। তারপর এক সময় বইটি নিয়ে নিচে নেমে এলো। স্টুডিও ঘরে ঢুকল না, বসে পড়ল বাইরের বারান্দায়।

প্রবীরের মনে হল, শকুন্তলার ঘুমের সুযোগ নিয়ে যদি কিছু চুরি করতে হয়, তাহলে এই বইটা।

বইটা যদি এখানে পড়া শেষ না হয়, তাহলে প্রবীর নিশ্চয়ই বাড়িতে নিয়ে যাবে।

খুব বেশিক্ষণ বসতে পারল না প্রবীর। আলো কমে এলো। সন্ধ্যে হয় নি, কিন্তু আকাশ অন্ধকার। কালো মিশমিশে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। তারপরই চমকাতে লাগল বিদ্যুৎ। সেই সঙ্গে গরগর গর্জন।

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে প্রবীর দেখল, শকুন্তলা একই রকম ভাবে শুয়ে অঘোরে

ঘুমোচ্ছে। এখন ওকে ডাকবার কোন মানে হয় না।

খুব জোরে একবার বজ্রপাত হতেই সেই আওয়াজে জেগে উঠল শকুন্তলা। বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, ক'টা বাজে?

প্রবীর বয়ল, সাড়ে পাঁচটা।

দারুণ চঞ্চল হয়ে শকুন্তলা বলল, কী সর্বনাশ! তোমার সঙ্গে বকবক করে আমি একবারেই ভুলে গিয়েছিলুম, আমার দারুণ কাজ আছে।

প্রবীর বলল, তুমি প্রায় দু'ঘন্টা ঘুমিয়েছ। আমার সঙ্গে বকবক তো কর নি!

আমার আজ পাঁচটার সময় প্রীতি হালদারের বাড়ি যাবার কথা। দুজন সাহেব আসবে ওখানে।

আকাশের যা অবস্থা, এখন যেতে পারবে কি?

আমায় যেতেই হবে। এই তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে?

প্রবীর দু'দিকে মাথা নাড়ল।

তোমার দ্বারা কোন উপকার হবে না, তা আমি জানতুম। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারবে অন্তত? শম্ভু হতচ্ছাড়াই বা গেল কোথায়?

আজ এখন তোমার যাওয়া হবে না, শকুন্তলা।

আলবৎ যাব!

শকুন্তলা দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একদল অশ্বারোহীর মতন এসে পড়ল প্রবল বৃষ্টি। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে পোশাক পাল্টে শাড়ি পরে নেমে এলো শকুন্তলা। কোন মেয়ের পক্ষে এত দ্রুত বেশ পরিবর্তন প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার।

কোন রকম প্রসাধন করে নিল শকুন্তলা। মাথার চুলও আঁচড়ায় নি।

নিচে নেমে এসে সে বলল, চল!

প্রবীর জিজ্ঞেস করলে, এই বৃষ্টির মধ্যে তুমি কি করে যাবে?

যেতে আমাকে হবেই। প্রীতিকে আমি কথা দিয়েছি।

বৃষ্টিতে ভিজতে আমার অসুবিধে নেই। কিন্তু তোমার ছাতা লাগবে না?

গুলি মারো ছাতা-ফাতা!

সদর দরজা খুলে বাইরে বেরুবার পর শকুন্তলা বলল, শম্ভু যদি চাবি নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ভেতরে ঢুকতে পাবে। নইলে থাকুক বাইরে বসে।

শকুন্তলাদের বাড়ি একটু গলির মধ্যে। সেখানে থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত আসতেই দুজনে ভিজে চুপসে গেল। এই সময়ে ট্যাক্সি ধরাও একটা অসাধ্য কাজ।

রাস্তায় বলতে গেলে একটাও মানুষ নেই, এখন সব কিছুই বৃষ্টির অধিকারে। আর মিনিট পাঁচেক এরকম বৃষ্টি হলেই এই সব রাস্তা নদী হতে শুরু করবে। ভবানীপুরের এই পাড়াটা জল জমার জন্য বিখ্যাত।

কত দুরে যাবে তুমি?

তালতলায়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছেই।

কোন মিনিবাসও তো সরাসরি ঐ রুটে যায় না।

এসপ্লানেড থেকে বদলে যাব। হয়তো ওদিকে বৃষ্টি হচ্ছে না।

পাতাল রেলের কাজের জন্য এ রাস্তা থেকে ট্রাম লাইন উঠে গেছে। মিনি বাসও দেখা যাচ্ছে না।

আজ তুমি যেতে পারবে না, শকুন্তলা,অসম্ভব ব্যাপার।

তুমি কেটে পড় তো! আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করবই।

প্রবীর শকুন্তলার একটা হাত ধরলো। বৃষ্টি ক্রমশই বাড়ছে, শকুন্তলার দু'গাল বেয়ে জল পড়ছে টপ টপ করে। তবু শকুন্তলা এমনভাব করছে যে বৃষ্টির কথা তার মনেই নেই।

উদ্‌ভ্রান্তের মত সে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছে কোন যানবাহন।

প্রবীর বলল, শকুন্তলা, চলো ফিরে যাই।

শকুন্তলা বলল, না। তোমায় তো আসতে বলি নি আমার সঙ্গে। তুমি চলে যাও না!

তোমাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিই কী করে? একদম ভিজে গেছ!

ইস! অন্য দিন আমায় কে দেখতে আসে? ঐ যে বাস আসছে।

একতলা একটা সরকারী বাস আসছে খুব মন্থর গতিতে। গাড়ি–বারান্দা ছেড়ে শকুন্তলা দৌড়ে মাঝ রাস্তায় বাসটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর দুজনেই বলে উঠল, যাবে না, এ বাস যাবে না!

কে শোনে কার কথা। প্রায় জোর করেই উঠে পড়ল শকুন্তলা। অন্য দরজা দিয়ে প্রবীরও উঠে পড়েছে।

বাসটা সম্পূর্ণ খালি। দুই কন্ডাক্টরই বলল, এ বাস খারাপ হয়ে গেছে, আমরা এতে লোক তুলছি না।

শকুন্তলা বলল, খারাপ হলেও চলছে তো দেখছি ঠিকই।

কন্ডাক্টর বলল, ফার্স্ট গিয়ার ছাড়া অন্য কিছু নিচ্ছে না। তাই কোনরকমে নিয়ে যাচ্ছি। যদি গ্যারাজ পর্যন্ত পৌছান যায়।

প্রবীর বলল, শুধু ফার্স্ট গীয়ারে চালিয়ে ইঞ্জিনের তো বারোটা বেজে যাচ্ছে।

কন্ডাক্টর বলল, সে আমরা কি করব!

গ্যারাজ কোথায়?

হাওড়া।

শকুন্তলা বাচ্চাদের মতন খুশি হয়ে বলল, যাক, এ বাসে আমাদের ভাড়া লাগবে না। আপনারা হাওড়া যাবেন তো, আমারা মাঝপথে কোথাও নেমে যাব।

প্রবীরের পাশে বসে পড়ে শকুন্তলা জিজ্ঞেস করল, তুমি উঠে পড়লে যে? তুমি কোথায় যাচ্ছ?

তোমার সঙ্গে।

তোমাকে আমি মোটেই প্রীতিদের বাড়িতে নিয়ে যাব না!

সে বাড়িতে আমি যাবও না। একদিনে দুজন মহিলার সঙ্গে পরিচয় করা আমার ধাতে সইবে না। আমি তোমাকে শুধু তালতলা পর্যন্ত পৌছে দেব।যদি পৌছান যায়।

ইস, ভিজে একেবারে জুবজুবে হয়ে গেছি। প্রীতির বাড়িতে পৌছে আমি না হয় ওর শাড়ি- টাড়ি চেয়ে পরে নেব। তুমি কী করবে? তোমার ঠিক নিউমোনিয়া হবে।

তাহলে তুমি সেবা করবার জন্য যাবে আমার কাছে।

আমি এখনও তোমার ঠিকানাই জানি না! তুমি মানুষ না ভূত, তাও জানি না।

আমার নাম যখন জেনেছ, তখন ঠিকানাও জানতে পারবে এক সময়।

শকুন্তলা একদৃষ্টিতে প্রবীরের দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, তুমি সত্যি বলছো, তুমি আমায় স্বপ্ন দেখেছিলে? ওয়েস্ট জার্মানিতে......সেই হোটেলের কাছে নদীর ধারে....অনেক রাত তখন...আমায় আর কেউ দেখে নি, কেউ জানে না।

শকুন্তলা, এখনো যেন তোমায় স্বপ্নের মধ্যে দেখছি....

বাইরে বৃষ্টি এমন ধেয়ে ধেয়ে আসছে যে মনে হয় যেন আজই প্রলয় হবে। অনেকদিন বাদে স্নান করছে এই শহর। মাঝে মাঝে চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে খুব তেজী বজ্রপাতের শব্দ।

শকুন্তলা বলল, এক সময় এই বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে বেড়াতে কী ভালই লাগত। এখন বয়স হয়ে গেছে–

প্রবীর বলল, এখনও আমাদের তেমন বয়েস হয় নি।

তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার কথা আলাদা। আমি চল্লিশ বছরের বুড়ি।

তোমার বয়স আটত্রিশ। আমার কি ধারণা জানো, সাইতিরিশ থেকে সাতচল্লিশ, এটাই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। মেয়েদেরও ছেলেদেরও।

কেন?

যার যা কাজ, সেটা সবচেয়ে বেশি ভাল করা যায় এই বয়েসেই। পৃথিবীকে উপভোগ করাও যায় সবচেয়ে বেশি করে।

তোমার বয়েস বুঝি সাতচল্লিশ?

না, আটচল্লিশ। একটু রং সাইডে পড়ে গেছি।

তোমার বয়েসটা অত মনে হয় না। এখনও বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

যাঃ! মেয়েদের মুখ থেকে এরকম কথা শুনলে ভাল লাগে।

যখন আমাদের বয়েস অনেক কম ছিল, তখন চল্লিশ বছর বয়েস শুনলে ভয় করত, না? মনে হত, চল্লিশ বছর মানে তো বুড়ো এখন কিন্তু চল্লিশ বছরটাকে অত কিছু ভয়ের মনে হয় না। আগে যা পারতুম, এখনও তা তো সবই পারি।

তুমি ভাবছ চল্লিশের কথা, আমি ভাবছি পঞ্চাশের কথা। পঞ্চাশও এমন কিছু খারাপ নয়।

এলগিন রোডের কাছে বেশ জল জমে গেছে। বাসটা ধকধক শব্দ করে থেমে থেমে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

প্রবীর বলল,ফার্স্ট গীয়ারে এতক্ষণ চলছে, এ গাড়ির ভাগ্য খুব খারাপ। কোথায় যে খতম হবে তার ঠিক নেই। এখানে নেমে পড়লে রিক্‌শা চেপে বাড়ি ফিরে যেতে পারো।

দেখাই যাক না কতদূর যাওয়া যায়।

ধন্য তোমাদের সাহেবপ্রীতি। তোমরা শিল্পীরা সাহেবদের নাম শুনলেই লালায়িত হয়ে ওঠ। সাহেব আসছে বলে ঝড়জলের মধ্যে ছুটে যেতেই হবে।

কবিদের বুঝি সাহেব প্রীতি নেই।

সাহেবরা বাংলা কবিতা পড়ে না, সেই জন্য কবিরাও সাহেবদের বিশেষ পাত্তা দেয় না। কিন্তু শিল্পীদের কথা আলাদা। কোন সাহেব একটু প্রশংসা করলেই.......

চুপ কর।

অপ্রিয় সত্য বলতে নেই, তাই না?

প্রীতির বাড়িতে যে দুজন সাহেব আসছে, তাদের মধ্যে একজন প্রীতির ছোট বোনকে বিয়ে করেছে। বিলেতে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এক সময়। আর একজন শুনেছি নাম-করা সায়ান্টিস্ট। এরা কেউ আমার স্কাল্পচার দেখে নি, কখনো দেখবার সম্ভাবনাও নেই। প্রীতিকে কথা দিয়েছি বলেই আমি যাচ্ছি। কথা রাখা আমার স্বভাব।

দেখেছ, ময়দানে দুটো গাছ ভেঙে পড়েছে? এদিকে ঝড়ও হয়েছে খুব।

তুমি লক্ষ্য রেখ, যদি কোন ট্যাক্সি চোখে পড়ে আমরা ঝুপ করে নেমে পড়ব।

কিন্তু কোন ট্যাক্সিওয়ালাই এই সময় ময়দানে ফাঁকা জায়গায় থেমে থাকে না বাজ পড়ার ভয় আছে। বৃষ্টি কমবার একটুও লক্ষণ নেই।

মহাযুদ্ধের সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভের কাছ দিয়ে বেঁকতে গিয়েই বাসের তলায় মড়মড় শব্দ হল। তারপর বাসটি একেবারেই থেমে গেল। কন্ডাক্টর দুজন বলল, যাঃ!

শকুন্তলা জিজ্ঞেস করল, এখন আপনারা কী করবেন?

বাসের মধ্যেই বসে থাকব। এই বৃষ্টির মধ্যে আর কী করা যাবে?

প্রবীরের দিকে ফিরে শকুন্তলা বলল,আমরাও কি বাসের মধ্যে বসে থাকব নাকি?

চল, নামি!

একজন কন্ডাক্টর বলল, দিদি, এই এত বৃষ্টি, এর মধ্যে নামবেন না। একটু অপেক্ষা করুন–

কিন্তু শকুন্তলা সে কথায় কর্ণপাত করল্ না।

দুজনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ স্তম্ভটির গা ঘেঁষে। কিন্তু তাতেও বৃষ্টি থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই।

শকুন্তলা বলল, ভিজতে যখন কিছু বাকি নেই, তখন চল্ হাঁটতে শুরু করি।

কোন্ দিকে?

শকুন্তলা জিজ্ঞেস করল, তুমি হাঁটতে রাজি নও?

প্রবীর বলল,হ্যাঁ, রাজি। কিন্তু কোন্ দিকে? নদীর দিকে না শহরের দিকে?

শকুন্তলা যেন দারুণ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। সে চোখ দুটি বিস্ফারিত করে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী বললে প্রবীর!

প্রবীর মুখে সামান্য হাসি রেখে বলল, তুমি হাঁটতে চাইলে , তাই আমি জিজ্ঞেস করলুম, কোন্ দিকে? নদীর দিকে, না শহরের দিকে? হাঁটার পক্ষে তো নদীর ধারই ভালো, তাই নয়?

শকুন্তলা বলল, তুমি গঙ্গার দিকে যেতে চাও? সে কথা আগে বল নি কেন। চল–

সত্যি যাবে? প্রীতির বাড়িতে যে সাহেব এসেছে–

ও প্রসঙ্গ একদম বন্ধ। মনে কর, আমার বয়েস আঠারো, আর তোমার বয়েস একুশ। আমরা লুকিয়ে প্রেম করতে বেরিয়েছি। তাহলে গঙ্গার ধার তো আদর্শ জায়গা। বৃষ্টির সময় ফাঁকাও হবে। আমার হাত ধর।

শকুন্তলার একটা করতল প্রবীর নিজের মুঠোয় ধরে পা বাড়াল।

শকুন্তলা বলল, আমাদের ব্যস্ততা কিছু নেই, বৃষ্টি থেকে গা বাঁচাবারও দরকার নেই, আমরা আস্তে আস্তে হাটব।

জনশূন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল দুজনে। প্রথম কিছুক্ষণ নিঃশব্দ।

একটু পরে প্রবীর জিজ্ঞেস করল, এই রকম সন্ধ্যেবেলা তুমি শেষ কবে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসেছ?

শকুন্তলা বলল, মনে পড়ে না। আমার মেয়ে যখন খুব ছোট ছিল, তখন ওকে নিয়ে কয়েকবার এসেছি।

কোন পরপুরুষের সঙ্গে আর আসো নি?

না। তুমি বুঝি প্রায়ই আসো?

আমার সন্ধ্যেগুলো আমার বন্ধু-বান্ধবরা নিয়ে নেয়। কখনো কখনো গভীর রাত্রে বন্ধুদের সঙ্গে আসি গঙ্গার ধারে, মদখাওয়ার জন্য।

আজ তোমার একুশ বছর, আমার আঠারো বছর।

শকুন্তলা, উত্তেজনায় আমার বুক কাঁপছে।

কেন?

আমি ঠিক একুশ বছর বয়েসীই হয়ে গেছি। সব কিছুই অবিশ্বাস্য লাগছে। তুমি আমায় বিশ্বাস করবে বল?

শকুন্তলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারি? কোনো সতেরো বছরের মেয়ে যদি কোনো একুশ বছরের ছেলের হাত ধরে নদীর ধারে বেড়াতে আসে, তা হলে সে কি আর ঐ ছেলেটিকে অবিশ্বাস করতে পারে? আমার যখন সতেরো বছর বয়েস ছিল.....

প্রবীর বললো, আমার যখন একুশ বছর বয়েস ছিল.....

তুমি কি বলবে বলছিলে?

এক্ষুণি বলবো, কিন্তু আমার বুক কাঁপছে।

কী, ব্যাপারটা কি?

তুমি আমায় মিথ্যেবাদী ভাববে না?

আগে বল কি হয়েছে?

মানুষের জীবনের সবচেয়ে ভাল ব্যাপার কি জানো? অনিশ্চয়তা! কিংবা আজকেই এক ঘন্টা বাদে কি ঘটবে তা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না। অনেক কিছু অলৌকিকের মতন ঘটে যায়। আজ আমার জীবনে সেই রকম একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে এখুনি। যা আমি নিজেই এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।

কী ঘটতে যাচ্ছে?

আর একটু ধৈর্য ধর। এই যে এসে গেছি প্রায়, এবার রাস্তা পার হতে হবে, খুব সাবধানে, এর মধ্যে যদি কেউ গাড়ি চাপা পড়ি, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

কোথাও কোন গাড়ির চিহ্ন নেই। তবু শকুন্তলার হাত ধরে প্রবীর খুব সতর্কভাবে রাস্তা পার হল।

উট্রাম ঘাটের পাশ দিয়ে গঙ্গার ধারের রেলিং-এর পাশে এসে দাঁড়াল তারপর একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে প্রবীর বলল, তাহলে সত্যিই হল!

শকুন্তলা কাছাকাছি একটা ছাউনির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, চল, ওখানে গিয়ে দাঁড়াই। আমার ব্যাগে সিগারেট আছে, তোমাকে খাওয়াব।

প্রবীর বলল, দাঁড়াও আগে তোমায় দ্বিতীয় স্বপ্নটার কথা বলে নিই।

দ্বিতীয় স্বপ্ন? হ্যাঁ, বল–

আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি না তো!

প্রবীর তোমার দ্বিতীয় স্বপ্নটা এবার বলো। কী দেখেছিলে? ভয়ের কিছু?

প্রথম স্বপ্নটা দেখেছিলুম, সেই জার্মানিতে একটা নাম-না-জানা নদীর ওপর দিয়ে তুমি খালি পায়ে হাঁটছ, তোমার খুব মন খারাপ। আর দ্বিতীয় স্বপ্নটাতেও তোমাকে দেখি আর একটা নদীর ধারে, সেটা চিনতে পেরেছিলাম, এই গঙ্গা। বৃষ্টি পড়ছিল, তবে এত জোরে নয়, টিপটিপ করে, তুমি আমার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললে, প্রবীর তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

শকুন্তলা স্থির দুই চোখে তাকিয়ে আছে প্রবীরের দিকে। তার সমস্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির জল। শাড়ি সম্পূর্ণ ভিজে গিয়ে লেগে আছে গায়ের সঙ্গে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার নিজেরই ভাস্কর্যের মতন বুক ও কোমরের খাঁজ।

প্রবীর বলল, সেই স্বপ্ন যে আজই সত্যি হয়ে উঠবে, আমি কল্পনাও করিনি। তুমি যে বাড়ি থেকে বেরুতে চাইবে, এরকম বৃষ্টি হবে,..সবই যেন অলৌকিক ভাবে ঘটে গেল।

শকুন্তলা তবু স্থির চোখে দেখছে প্রবীরকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, সত্যি প্রবীর, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। অনেক অনেক কথা...তুমি চলে যাবে না তো?

প্রবীর দু'হাত বাড়িয়ে শকুন্তলাকে বুকে টেনে নিল। তাকে জড়িয়ে ধরল প্রবলভাবে। তারপর গঙ্গা নদীকে সাক্ষী রেখে সে শকুন্তলার ওষ্ঠে চুম্বন করল অনেকক্ষণ।

এখন কেউ কোন কথা বলবে না।

–সমাপ্ত–